TARUNER AHOBAN
by
Subhas Chandra Bose

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৪

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

মূল্য : দশ টাকা

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড । কলিকাতা ২৬

মুদ্রক :
দাস প্রিন্টিং হাউস
৮/বি অক্রুর দত্ত লেন
কলিকাতা ১২

নিবেদন

বাংলা তথা ভারতের মন জুড়ে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক তরুণ সুভাষচন্দ্র তরুণদের সম্মুখে প্রথমে সেবার আদর্শ স্থাপন করেন। তারপর দেশের মুক্তির জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে, দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে— সেজন্য তারুণ্য-শক্তির ত্যাগ চাই, সেবা চাই, সংগ্রাম চাই। জীবনের লক্ষ্য কি, আদর্শ কি, কী তার পথ? বিশ দশকে কারামুক্তির পর ত্রিশ দশকে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সুভাষচন্দ্র তারুণ্য-শক্তিকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। দেশসেবার, আদর্শবোধের, মানুষ তৈরির এবং মুক্তিযজ্ঞের সে অমোঘ আহ্বান তারুণ্যশক্তির প্রতি শাশ্বত আহ্বান। এই আহ্বানের চিরন্তন উদ্বেলতা যৌবনের চিত্তপটে সুভাচন্দ্রের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরম্পরার এবং ভারতের বাণী বা ভারতীয়তার সন্ধান দেবে সুভাষচন্দ্রের তারুণ্যশক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণগুলি।

'তরুণের আহ্বান' এই লক্ষ্য নিয়েই প্রকাশিত হল।

কলকাতা
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৪

প্রকাশক

তরুণের আহ্বান

শ্রদ্ধাস্পদ ভদ্রমণ্ডলী ও প্রীতিভাজন তরুণ বন্ধুগণ—

আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আমি আপনাদের সাদর সম্বর্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এই সৌভাগ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে, সেটা এই যে আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার অনাচারের মধ্যে— সবার উপর মনুষ্যত্বের পদে পদে অপমানের মধ্যে। এই তো আমাদের সাধনার ক্ষেত্র, এখানে মাধুর্য কিছু নাই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে, এইখানে নিষ্ঠুর দুঃসহ আবির্ভাবের মধ্যে আমাদের যোগসাধনার জন্য দাঁড়াতে হবে। আনন্দ এই যে এখানে ভোলাবার কিছু নেই, অপরিসীম রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে— পশুশক্তির সাধনায় নয়, কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়— এখানে সমাহিত আত্মসাধনার দ্বারা, সর্বস্পৃহাশূন্য পুণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা, নরনারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মুহ্যমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে।

তাই বলছিলাম এত বড়ো দুশ্চর সাধনায় আপনাদের আহ্বান করবার সুযোগ যে আমি পেয়েছি— এ আমার পরম সৌভাগ্য, আর আমার পরম আনন্দের কথা এই যে— আমি এই কঠিন তপস্যার জন্য সত্যের পথে আহ্বান করছি— বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে। আমি আজ দেহে, মনে, আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এক হয়ে তাদের কাছে আমার প্রীতির অর্ঘ্য উপহার দিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলি— হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো যুগে যুগে, দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে এসেছ, মুক্তিপথের নিশানধারী তোমরাই তো চিরদিন অগ্রগামী হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ। তোমরা যে জেগেছ, অলস বিলাস পরিহার করে তোমরা যে আজ আত্মভোলা হয়ে পথে চলবার জন্য দাঁড়িয়েছ তা আমি জানি— জানি বলেই তো তোমাদের আহ্বান করার সাহস আমার হয়েছে।

প্রলয়ের ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, বর্ষার দুর্যোগকে মাথায় করেও আমরা সমান দাঁড়িয়ে আছি। সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ্য-বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন তো আর বসে বসে তর্কযুদ্ধ করে জাতির লজ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের অপমানকে দিন দিন বাড়ালে চলবে না।

চেয়ে দেখো, যেখানে আমাদের সত্যকার দেশ, যেখানে আমাদের জীবনের আশা, ভরসা, উৎসাহ, মান, সম্পদ, সেখানে আমরা নাই। সেখানে—

"গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার নিঝুম দিবস রাতি,
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈলবিহীন বাতি।
গম ধরে আছে পাতাটি কাঁপে না, ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতাবিহীন দেবালয় আজ, জনহীন সব গেহ।
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য—রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম।"

তাই আমাদের দেশের বেদনাময়ী মাতৃমূর্তি নয়নজলে ছিন্ন অঞ্চল ভিজিয়ে আমাদেরই আশায় বসে আছেন।

যেখানে জীবনের লীলাখেলার আনন্দের লুঠ হত, যেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎসগুলি প্রাচুর্যে আমাদের ভাণ্ডারে উপচে পড়ত, যেখানে জলে সুধা, ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণদায়িনী শক্তি ছিল—সেখানে আজ বিরাট শ্মশান খাঁ খাঁ করছে— প্রেতের ছায়া দেখে অর্ধমৃত প্রাণ শিউরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে— এক বিন্দু জল নাই, এতটুকু জীবন নাই।

তোমরা জাগো ভাই, মায়ের পুজোর শঙ্খ বেজেছে, আর তোমরা তুচ্ছ দীনতা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না।

এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ, আজ মা সত্যই বুঝি ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখো, চারি দিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। কী বিরাট! কী মহিমময়!

শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়বিধায়িনী সর্বাণী, সদা হাস্যময়ী, সেই তো আমার জননী। শারদ জ্যোৎস্নামৌলি মালিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অসুর-দর্প-খর্ব-কারিণী,

মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তরাগরঞ্জিত পা দু'খানি রেখে বলছেন— "মাভৈঃ— জাগৃহি।"

জাগো মায়ের সন্তান, দূর করো তোমাদের বৃথা তর্ক, ধার করা কথার মালা, ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দাও তোমাদের বিলাস ব্যসন, মুছে ফেলো তোমাদের ললাট হতে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ঐ দাসত্ব-কালিমার রেখা।

নবীন সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টিশক্তির প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সমস্ত উন্মাদনা সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ছোটো নই আমরা বড়ো, নইলে সমস্ত ম্রিয়মাণ ধ্বংসোন্মুখ উপাদানের উপর এই নব সৃষ্টির দুরূহ ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন কেন?

মনুষ্যজীবনেব পরম সার্থকতা সৃষ্টির আনন্দে। আমরা আজ সেই সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব।

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহংকারের জন্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বেব আত্মম্ভরী জ্ঞান হইতে নয়— আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বাবা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করব, তা শুধু নিজেদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য, আত্মবিস্মৃত পুরুষ-সিংহের জাগবণের জন্য মথিত নব-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য। অনাদি কাল হতে ভারতবর্ষের যে মহান্ আদর্শ পরসেবাব্রতে প্রারব্ধ হয়েছে, তা এই সেবাব্রতেই উদ্‌যাপিত হয়ে আমাদের সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে।

আমি জানি এই দুর্দিনে আমাদের এই সাধনা কঠোর, অতি ভয়ংকর—

"পিছনে উঠিছে ঝড়, সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নামমাত্র পথরেখা, তাও আজ হয়েছে নির্জন,
চরণ চলে না আর, দেহলতা কাঁপে থর থর,
কণ্টকে সংকট পথ, চোখ দু'টি জলে ভর ভর।
তবু যে গো যেতে হবে, থেমে থাকা মরণের দায়,
কেন মিছে থেমে যাও, হে পথিক, ঘরের মায়ায়?
সর্বহারা মহাপ্রাণ, তাহারে কে রাখে বন্ধ করে,
আলোর ইশারা আসে, প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে।

মৃতদেহ আগুলিয়া, সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে, এক বিন্দু অমৃতের দান।"

এই অমৃতের দানের আশায় আমরা থাকব, নিশ্চেষ্ট হয়ে নয়, অদৃষ্টবাদীর মতো নয়, দুর্বল পরমুখাপেক্ষীর মতো নয়— আমরা আমাদের স্বাধীন, আত্মস্বতন্ত্র কর্মঠ শত শত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকব। সমগ্র বাংলায় এইরূপ অসংখ্য কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেখানে কোনো কর্মকেন্দ্র নাই, সেখানে উৎসাহী কর্মীদলকে সংঘবদ্ধ করে নূতন কর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যে-সকল স্থানে কর্মকেন্দ্র পূর্ব হতে জাগ্রত অথবা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে সে-সবগুলিকে বর্তমানের কর্মোপযোগী করে, নূতন প্রেরণা দিয়ে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত করে, একটা বিরাট কর্মকেন্দ্রের অঙ্গীভূত করতে হবে। আমাদের আদর্শ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে নানাভাবে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত সকল কর্মকেন্দ্রের মধ্যে একই দুর্লঙ্ঘ্য অনিবার্য শক্তি আমাদের সমস্ত কর্মসাধনাকে সেই একই পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এইরূপে আমরা 'এক' হইতে 'বহুতে' এবং 'বহু' হইতে 'একের' মধ্যে একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের সৃষ্টি করে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্রকে আন্তরিক ঔদার্যের দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষে সুলভ করে আমাদের কর্মবাহুল্যের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বিধান করতে পারব।

সেখানে রাজনীতিক মতদ্বৈধের কোনো স্থান থাকবে না, সমাজপদ্ধতির কোনো বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানকে গোঁড়ামির দ্বারা বড়ো করে দেখা হবে না, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না— সেখানে সমস্ত দেশবাসী জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, একই লক্ষ্যে, একই পথে আপন আপন মনুষ্যত্বকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করে আমরণ চলতে থাকবে।

জনশিক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদাবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করে তাকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসোন্মুখ পল্লীসমূহের সংস্কার দ্বারা দেশের লুপ্ত সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই-সব বিভিন্ন কর্মের ভার আমাদের কর্মকেন্দ্রগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কর্মকেন্দ্র ক্ষুদ্রই হউক আর বিরাটই হউক, যেখানে সহকর্মীর

সহায়তা, সুমানুভূতি ও কর্মকুশলতার অভাব, সেখানে কোনো কাজে সাফল্য লাভ করা যায় না। যেখানে সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, হাসিকান্নার অংশ হিসাব আছে, সেখানে সাহচর্য অযাচিত ভাবে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল কর্ম সফলতার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কাজে সাধারণের হৃদয় বিনিয়োগ হয়, তা অসাধ্য হলেও সমবেত ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার বলে সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। আন্তরিকতাবিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভিশাপে দুষ্ট— কাজেই আত্মনাম-ঘোষণার চেষ্টার মধ্যে কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কাজের মধ্যে সার্থকতা নাই। তাই বলি, আমাদের হৃদয় দিয়ে কাজ করতে হবে, 'ছুৎমার্গ' পরিহার করে অস্পৃশ্যতা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার বলে আলিঙ্গন করতে হবে। মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, বিবেকের গলা টিপে ধরলে কুকর্ম আরো জোর গলায় প্রচারিত হবে।

অন্তর থেকে যে কর্ম-শক্তি আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করবে, যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে সেই শক্তি, সেই বলকে আহুতির অগ্নির মতো চিরন্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে।—আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই, অনুকম্পা চাই— সবার উপরে মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের সাধনা— জীবনব্যাপী এই সাধনার মধ্যে আমাদের মুক্তি— নান্যঃ পন্থা।

মিলনের এই পুণ্য দিনে, এই কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানকল্পে, প্রারম্ভেই আমি আপনাদের আহ্বান করছি। এ আহ্বান তাঁর, যিনি আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী, বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন, আহ্বান করেছেন— ভোগ থেকে বিরত হয়ে ত্যাগ করবার জন্য, অবসাদ থেকে জেগে উঠে কর্ম করবার জন্য, বিস্মৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের জাতির ইতিহাস-লব্ধ আত্মাকে অনুভব করবার জন্য। নরনারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করবার নয়। রোগে যারা অবসন্ন, দারিদ্র্যে নির্যাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি— সে আদেশ আজ দেশের কানে পৌঁচেছে, তাই আজ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন— ভোগবিলাস ও আরামের মাঝখানে নয়—যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে নির্যাতন, যেখানে অপমান—সেখানে গিয়ে আজ তাঁকে পুজা করতে হবে। পুরাতন পুঁথি পড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে না, আশার গান গেয়ে তাকে শুনাতে হবে— যে আশার গানে রোগী বিছানা থেকে বল পেয়ে উঠে দাঁড়াবে, ঋণ-ভার-জর্জরিত

কৃষক সাহস করে কাঁধে লাঙ্গল তুলবে, অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবর্ষসঞ্চিত দুঃখের গুরুভার লাঘব হয়েছে বলে মনে করবে।

আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সংগীতের আনন্দধ্বনি আসছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। এ কী উৎসাহ। এ কী আনন্দ। আমার মনে হয় এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোন্ ওপার থেকে আনন্দে এক সোনার সুতায় কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিকিয়ে উঠছে—ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছে, আবার সেই সোনার সুতাই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙা রাখী হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিযে দিচ্ছে ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে, কর্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পুণ্য দিনের ভরসার কিরণ-সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতেব সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন, যিনি ওপারে দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন—এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণসূত্রের সৃষ্টি করছেন—তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়— জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ কবব।

ডিসেম্বব ১৯২২

তরুণের স্বপ্ন

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে— ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ-রূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব— সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসংকুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ— সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ। তনু-মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু শিব আছে— তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ;
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি— তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক— আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুন্নই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে— সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত— তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালোবাসি— অজানা ভবিষ্যৎই আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ 'ভুল করিবার অধিকার'। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন বর্ষাকালে সর্ব-দেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি— বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ— আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা— সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্যজীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই— সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা— যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি

রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি— জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সংগীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কী না করিয়াছি— ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান— যে-কোনো দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখো— দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অংগুলিসংকেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তান্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সংগে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো কথা, সব চেয়ে বড়ো আশা— তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে— তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন— এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষত যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

মে ১৯২৩

তোমরা সংগঠিত হও

তোমাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলে আমার বারো বছর আগের ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়া যায়। সে সময় আমার মন এই কথা ভাবিয়া পীড়িত হইত যে আমরা কি আমাদের জীবনে একঘেয়েমির প্রভাব কাটাইতে পারি না, আমাদের চিরস্থায়ী রুটিন-বাঁধা কর্মসূচীকে সরাইয়া দিতে পারি না, অজানার অভিসারে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে কি চলিতে পারি না? আমাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য, নূতনত্ব বা অনিশ্চয়তা নাই। আমাদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি বলিয়া কোনো কথাই জানা নাই। বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইংরেজদের অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। যখন একটি গোটা জাতি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য পাগল হইয়া ওঠে তখনই ইহা সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া যায়।

আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বলিয়া একটি সংবাদপত্র কলমের পর কলম আমার নিন্দায় ব্যয় করে। উক্ত সংবাদপত্রে বহু মিথ্যা কথা লেখা হইতেছে। কিন্তু একটি সত্য কথা তাহারা লিখিয়াছে যে আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। সত্যই ঐ বহিষ্কারের ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল। যখন ছকবাঁধা পথে চলিতে আমরা বিরত হই তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হই। যুবক ও ছাত্রবা বিদ্রোহ করিয়াছে এই মর্মে বহু অভিযোগ শুনিয়া থাকি। যদি তাহাই হয় তবে ঐ বিদ্রোহ কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া দাবি করার স্পর্ধা কাহারো নাই। ইহা যুগের লক্ষণ মাত্র। কেহই বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবে না ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলায় ছাত্রবা প্রভৃত সাফল্যের সঙ্গে যে হরতাল পালন করিয়াছে তাহা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র ও নেতারাই উহা ঘটাইয়াছেন। উহা যে একটি ব্যাপক জাগরণের ফল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না। এ জাগরণের তরঙ্গ রুখিবে কে? যখন ছাত্রদের জাগরণ ঘটিয়াছে তখন উহা ঠিকভাবে খাঁটি পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে—এই কথা বলিয়া আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা হইতেছে। শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন অবশ্যই মানিয়া চলিতে

হইবে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আইন শৃঙ্খলা মানার কথা বলা হইলে আমি তাহাতে কর্ণপাত করিব না।

বর্তমানে তরুণ সমাজ কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ হইয়াছে। তাহারা সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করিতেছে বা হাঁটিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইতেছে। এ সবই স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। মানুষ অসীম উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব না করিলে কোনো মননশীল, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজ করিতে পারে না।

আমার মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগে, আইন সভায় অংশ লইয়া কিংবা বিদেশী বস্ত্র বয়কট করিয়া আমরা কি স্বরাজ লাভ করিতে পারিব? এমন কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী নাই একমাত্র যাহার সাহায্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব। যে মুহূর্তে সমগ্র জাতি স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবে সেই মুহূর্তেই আমরা স্বাধীন হইব— তাহার আগেও নহে, পরেও নহে।

মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি তাসের ঘর মাত্র। আমাদের সম্মতির উপরই ইহার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে আমরা অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত লইব সেই মুহূর্তে ইহা ধূলিসাৎ হইবে। এই মর্মে জনৈক ইংরেজও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে এক দিনে যে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এক রাত্রিতেই তাহা বিলীন হইয়া যাইবে। এরূপ 'জাতীয় ইচ্ছা' জাগাইয়া তুলিতে হইলে দেশের সামনে নানারকম কৌশল ও কর্মসূচী রাখিতে হইবে।

তোমরা যাহা চাও তাহা পাইতে হইলে তোমাদের সংগঠিত উপায়ে চলিতে হইবে। নৈতিক যুক্তির সাহায্যে সকল ছাত্রের একটি ফেডারেশন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ দেশের সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াও। এ দেশের আদর্শ কংগ্রেসেরও আদর্শ। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করা সেই আদর্শেরই অঙ্গ। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়ে তোমরা কংগ্রেসকে সাহায্য করো। তারপর যে-বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ দিতে হইবে তাহা হইল তোমরা সবল দেহ গঠন করো। সাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধীর তুলনায় লেনিনের অনুগামীর সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু লেনিন তাঁহার লক্ষ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন। লেনিনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছে কারণ তাঁহার অনুগামীরা ছিল সংগঠিত। যুবকরা তাহাদের জীবনের এই নির্মল পর্বে এই মন্ত্র গ্রহণ করুক যে এখন হইতে তাহারা সততার সঙ্গে ও যুক্তিযুক্তভাবে, ধর্মাচরণের মতো, দেশের স্বাধীনতার কাজে সাহায্য করিবে।

এপ্রিল ১৯২৮

ছাত্ররাই স্বাধীনতার অগ্রদূত

এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ছাত্র ও তরুণ সমাজের উপর আমার কোনো প্রভাব থাকুক তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কলিকাতার দু-একখানি সংবাদপত্র এমন কথা বলিতেও দ্বিধা করে নাই যে কলিকাতায় ছাত্র-অসন্তোষের জন্য আমি ও আর দু-একজন রাজনৈতিক নেতা দায়ী। কিন্তু ইহা সত্যের অপলাপ মাত্র। কলিকাতায় যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহা অধুনা সারা বিশ্বে যে বিক্ষোভের মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহারই অংশ মাত্র। তরুণ-চিত্তে যে বিক্ষোভের ভাব উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা দেখিতেছি। এই প্রকাশকে জোর করিয়া কেহ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে না।

ছাত্ররা যখন আমাদের কাছে উপদেশের জন্য আসে তখন তাহাদের এই মনোভাবকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া নিশ্চয়ই আমার মতো রাজনৈতিক কর্মীর কর্তব্য নয়। যদি আমি ছাত্রদের উপদেশ দিয়া কোনো অন্যায় করিয়া থাকি তবে সে অপরাধ আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইব। ছাত্ররাই দেশের আশা। বিশ্বের সর্বত্র তাহারাই স্বাধীনতার অগ্রদূত। তাহাদের লক্ষ্য দেশকে স্বাধীন করা ও নতুন জাতি গঠন করা। ইহা সহজ কাজ নহে। ইহার জন্য দরকার বহু ভাবনা-চিন্তা, প্রস্তুতি ও আত্মত্যাগ। দেশের তরুণদের ইহা করিতে হইবে। নিজের আদর্শ স্থির ভাবে অনুসরণ করিয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো বেদনা নাই। একজন দর্শকের নিকট যাহা নেহাতই দুঃখকর বলিয়া মনে হয়, একজন উচ্চ আদর্শের অনুসারীর নিকট উহাই আনন্দ-স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, আত্মত্যাগের মধ্যেই পাওয়া যায় খাঁটি আনন্দ। যে ব্যক্তি যত আদর্শ-পাগল সে ব্যক্তিই তত আত্মত্যাগের শান্তি উপলব্ধি করে। প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম শক্তি সুপ্ত আছে। স্বাধীনতাহীনতার মর্মজ্বালা যে মুহূর্তে কেহ অনুভব করে তখনই তাহার সুপ্ত-শক্তি জাগরিত হয়।

দেশ দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা

ইত্যাদি নিবারণযোগ্য ব্যাধির প্রকোপে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের জীবন যারপরনাই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাথমিক হইতে উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত আজিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল বর্তমান সরকারের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। মেকলে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন যাহার ফলে এদেশের লোক ইংরেজের রীতিনীতি ও আচারপ্রথার অন্ধ অনুকরণ করিয়া পরম পুলক লাভ করার মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবে। বস্তুতপক্ষে, এরূপ এক শ্রেণী ভারতীয়ের উৎপত্তিও হইয়াছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল যথেষ্ট খারাপ হইয়াছে। এখন যতটুকু ভালো ফল আদায় করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে। আমাদের দেশ স্বাধীন নয় বলিয়া বিদেশেও ভারতীয়রা মর্যাদা পায় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বরাজ পাইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেব জীবনধারণের সার্থকতা থাকিবে না। আমরা আমাদের প্রাথমিক অধিকার-গুলি হইতেও বঞ্চিত। ঐগুলি বাদ দিয়া যে শাসনতন্ত্রই রচিত হোক আব যে অধিকারই আমরা পাই তাহার কোনো মূল্য নাই, তাহা বিফল।

এই সন্ধিক্ষণে তরুণদের প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য হইল সারা দেশে এমন অগণিত সংগঠন গড়িয়া তোলা যেগুলি হইবে একটি সৈন্যদলের বিভিন্ন রেজিমেন্টের মতো— জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে তাহারা সকলে সমবেত হইবে। একই লক্ষ্যে উদ্‌বুদ্ধ ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সংগঠনগুলি দেশে এক বিপুল শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হইবে স্বরাজলাভ। অহিংসার পথেই ইহাদের পরিচালনা করিতে হইবে। সন্দেহ নাই যে সরকারের বেতনভুক ভৃত্যরা উস্কানিদাতা রূপে আসিবে; তাহারা দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচারের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিবে ও অপরিণত তরুণদের অবিবেচনাপ্রসূত কার্য করিতে প্ররোচনা দিবে ও আমাদের বহুসংখ্যক মানুষকে ফাঁদে ফেলিবে। কিন্তু এই হতভাগ্য ভাড়াটিয়াদের দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। এই-সব জীবদের কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যখনই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা ওঠে, তখনই অনিবার্যরূপে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, খালি বোতল ও মরিচাধরা পিস্তল আবিষ্কার করা হয় ও বিশ্বজনসমক্ষে ঘোষণা করা হয় যে বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সারা দেশের ভিতর এই যে সংগঠনের জাল ছড়াইয়া থাকিবে তাহার ভিতর হইতে একদল কর্মী ব্রিটিশ-বস্ত্রের বিরুদ্ধে নিবিড় প্রচার চালাইয়া যাইবে ও এইভাবে স্বদেশী পণ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে ; আর একদল কর্মী ঐরূপে প্রস্তুত ক্ষেত্রের সুযোগ লইতে অগ্রসর হইবে। এইভাবে পাশাপাশি ধ্বংসাত্মক ও গঠনাত্মক কাজ চালাইতে হইবে। সমান্তরাল দুই শ্রেণীর সংগঠন থাকিবে। একশ্রেণীর সংগঠন সংগ্রামমুখী প্রচারকার্য চালাইবে, আর-এক শ্রেণীর সংগঠন ঐ প্রচারের দ্বারা লব্ধ ফল সংহত করিয়া তুলিবে— প্রথম দলের দ্বারা বিজিত ভূমির উপর দ্বিতীয় দল দখল কায়েম করিবে।

ছাত্রদের কাছে আমার আবেদন, তোমরা ধূমপানের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করো। ধূমপান করিয়া ধূমপানকারীর কোনো উপকার হয় না। বরং দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা ধূমপান খাতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

স্থানীয় সংস্থাগুলি কংগ্রেসের কর্মীদের দখল করার প্রয়োজন আছে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করা যায়। পৌরসংস্থাগুলিতে রাজনীতি আমদানী করা উচিত নয়— এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না।

এপ্রিল ১৯২৮

তরুণের মিশন

তরুণদের মিশন হইতেছে তাঁহাদের নিজেদের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নূতন পৃথিবী রচনার দৃঢ় অঙ্গীকার। যুবকদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনকে আমি যুব-আন্দোলন মনে করি না। যে আন্দোলন একটি আন্তরজাগরণপ্রসূত এবং ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে নূতন বিশ্বাস ও স্বপ্নের দ্বারা অনুপ্রেরিত, সেই আন্দোলনই একমাত্র যুব-আন্দোলন! তরুণের প্রথম মিশন: আপনার মধ্যে স্বরাজ এই অনুভূতি লাভ করা; দ্বিতীয় মিশন: সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সেই উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপদান। আমি তরুণের এই মিশনে বিশ্বাস করি। কেননা তরুণদের সাহচর্যে আমাদের মধ্যেকার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রকাশ লাভ করে। ভারতের যুবসমাজ যথেষ্ট পরিমাণে আত্মসচেতন নন। এই সমাজ যুব-আন্দোলনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতঃপর জগৎ-সভায় ভারতের মিশন সম্পর্কেও তাঁহাদের অস্পষ্ট ধারণা তো আছেই। আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে আমি এই মন্তব্যটি শুনিতে পাই যে আমাদের নেতারা যথার্থ নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হইয়াছেন। যুব-সম্প্রদায়ের কর্তব্য হইতেছে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের হাতে পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। চারিদিকে তাকাইয়া দেখুন এবং অনুভব করুন কিভাবে আধুনিক ইতালির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তাহা সম্ভব হইয়াছে ম্যাৎসিনি এবং তাঁহার কর্মে ও স্বপ্নে সহযোগীদলের ধ্যানে ধারণায়। জার্মানী, পারস্য, চীন এবং আজিকার অন্যান্য দেশের রূপরেখা কোন্ কোন্ প্রেরণায় নির্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছে? বলা বাহুল্য, সেই-সব দেশের যুবকদের স্বপ্নই সেই রূপরেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আমি আবার বলিতে চাই, ভারতীয় যুবকদের একটি ত্রুটি হইতেছে তাঁহারা যথেষ্ট আত্মসচেতন নন। আজ ভারতের লক্ষ্য দুইটি:— ১. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান; ২. বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতের দান তুলিয়া ধরা ও বিশ্বসমস্যার সমাধানে তাহার ভূমিকা পালন। এই মিশন কার্যকরী করিতে হইলে ভারতীয় যুবকদিগকে আমাদের ইতিহাসের অতীত সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হইতে হইবে এবং

তাঁহাদের এই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে হইবে। আর সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে ও যৌথ জীবনে রূপদানের জন্য একটি জ্বলন্ত আগ্রহ অতি অবশ্য চাই। আমি যেরকম বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে আজিকার সক্রিয় আদর্শগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসিত জাতিগুলির ফেডারেশন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু সংস্কৃতির ফেডারেশন গঠন। ভারত নিজের জাতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলে তবেই বিশ্বসমস্যার সমাধানপ্রয়াসে স্বীয় অংশ লইতে পারিবে।

অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা

জাতীয় সমস্যার সফল সমাধানের জন্য ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং এদেশের সভ্যতার নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ভারতীয় যুবকদের সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া চাই। আমার দৃষ্টিতে সময়ের তটপ্লাবী একটি বিশাল নদীর মতো এই ভারতীয় সভ্যতা। সেই নদীতে আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংস্কৃতির স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, বাংলা হইতে গুজরাট পর্যন্ত এই সভ্যতা একটি ঐক্যে বিধৃত। আপাত-বৈচিত্র্যও তাহার মধ্যে থাকিতে পারে। আমাদের ইতিহাস বলিতেছে তাহারা বিচিত্র কিন্তু বিদেশী-রচিত ইতিহাস হইতে আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহা আমাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমাদের অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকানো ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের সভ্যতায়, শিল্পে, দর্শনে, ধর্মে এবং সমাজ-বিজ্ঞানে এই সভ্যতার কীর্তি অনুভব করিবার মতো ইতিহাস-চেতনা আমাদের জাগাইয়া তোলা চাই। এই সভ্যতার মধ্যে হিন্দু বা মুসলমানের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নাই। ইহা বিভিন্ন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফলমাত্র। চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল তাজমহলের রূপের দিকে তাকাইয়া দেখুন এবং যে মন এই শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় ছিল, তাহার সৌন্দর্য অনুভব করুন। আমাদের বাঙালী কবি আশ্চর্যভাবে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন: 'এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'। মুঘলরা যদি তাজমহল ব্যতীত কিছুই না রাখিয়া যাইতেন, তবু আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিতাম। ব্রিটিশ শাসনের দিন যেদিন শেষ হইয়া যাইবে, সেদিন এই সরকার পশ্চাতে কী রাখিয়া যাইবে? কারাগারের কুৎসিত প্রাচীর এবং তাহার বিকট কারাকক্ষগুলি ছাড়া ব্রিটিশ সরকার আর কিছুই রাখিয়া যাইবে না।

ভারতের বিশেষ মিশনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের এবং বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয় সঞ্চারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইউরোপও এই কাজটি চাহিয়াছে। কিন্তু কিভাবে? এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ইংলন্ড ও অন্যান্য দেশের কী কীর্তি? আফ্রিকা ও এশিয়ার যে-সব প্রাচীন অধিবাসী ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিয়াছিল, তাহাদের কী অবস্থা দাঁড়াইয়াছে? আমেরিকা নিগ্রো-সমস্যার সমাধান কিভাবে করিয়াছে? ইউরোপ-আমেরিকার সেই পথ ভারত পরিহার করিয়াছে। এ দেশ তাহার নিজের অন্তরের আলোতে সমস্যা-সমাধানের পথ সন্ধান করিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্য দিয়া বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমন্বয় সাধন ভারতবর্ষ করিয়াছে। কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরূপ। তাই এখন আমাদের আরো উদার বিজ্ঞাননির্ভর সমন্বয় চাই।

আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রগতি

আমি মনে করি ভারতীয় ইতিহাসের পরিচয় শুধু ধর্মে ও সংস্কৃতিতেই দেওয়া যায় না, এমন-কি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় দেওয়া যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারত তার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হইতে পারে। ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে ভারতীয় হকি খেলোয়াড় দল যেভাবে তাঁহাদের বিজয়ী ভ্রমণ সারিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে ভারত এই খেলোয়াড় দলের এক উপযুক্ত মাতৃভূমি। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধিত্বের জন্য এই দল নিশ্চয়ই গঠিত হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন একটি মস্তবড়ো কাজ। তাহাতে আমাদের ভয় পাইলে চলিবে না বরং এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদের উদ্দীপ্ত করুক। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইতেছে, ততদিন ভারতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কখনোই সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে ভারতের নবজাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবে একটি যান্ত্রিক উপায়ে হয় নাই। আমি বিশ্বাস করি, ইংলন্ড যদি আজ ভারত হইতে তল্পিতল্পা গুটাইয়া নেয়, তথাপি ভারতের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। ভারত কখনোই অন্ধকার দিনগুলিতে ফিরিয়া যাইবে না। হে আমার তরুণের দল, আপনারা মশাল হাতে বাহির হইয়া পড়ুন, সারাদেশে বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইয়া দিন। গ্রেট ব্রিটেন দূরে থাক্, বিশ্বের কোনো শক্তিই সেই পবিত্র অগ্নি নির্বাপিত করিতে পারিবে না।

মে ১৯২৮

তরুণের সাধনা

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া তরুণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। শুধু বর্তমান যুগে কেন— যুগের পর যুগ যখনই কোনো জাতির জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই এই আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

তরুণ-আন্দোলনের স্বরূপ

প্রকৃতপক্ষে তরুণ-আন্দোলন বলিতে যে-কোনো তরুণের আন্দোলনকেই বুঝায় না। তরুণদের আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, লক্ষ্য আছে। যেখানে এই বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই তরুণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তরুণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা। সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই নিত্য নূতন সৃষ্টি করা তরুণ-আন্দোলনের লক্ষ্য। যেখানেই এই সৃষ্টি, সেখানেই প্রকৃত জাগরণ।

জাতির পুনর্জন্ম

মানুষের জীবনে যেমন— জাতির জীবনেও তেমনই শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে। অনেক সময় জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; আবার অনেক সময় জাতি বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহার আত্মা মরিয়া গিয়াছে, এরূপও দেখা যায়। জাতির জীবনে এই উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। 'Evolution of Civilisation' নামক পুস্তকে গ্রন্থকার জাতি-জীবনের এই মৌলিক নিয়মটি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সভ্যতা মরিয়া যায়, কিন্তু আবার তাহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিলেও এই প্রশ্ন আসে— আমরা কি প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া আছি? ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমরা অনেকবার মরিয়াছি, এবং অনেকবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে যত সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্যাবিলন, পালেস্টাইন, মেসোপোটামিয়া, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া

গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি দুই-একটি জাতি এখনো বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, আজ মিশরের সভ্যতা আবার জাগিয়া উঠিতেছে, রোম ও গ্রীসে আবার নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে।

জাতির সৃজনী শক্তি

চীন ও ভারতের সভ্যতা এখনো বাঁচিয়া আছে। আমাদের প্রাচীন চিন্তার ধারা, সভ্যতার ধারা এখনো জীবিত আছে। জাতি বাঁচিয়া আছে কিনা, তাহার মাপকাঠি হইতেছে— সে জাতি নূতন সৃষ্টি করিতে পারে কিনা। কিন্তু যখন সে সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্ব না থাকে, যদি তাহা শুধু গতানুগতিক পথেই ধাবিত হয় তবে তাহা প্রকৃত সৃষ্টি নহে। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি নূতন সৃষ্টি দেখা দেয় তবেই জাতির জীবনে যথার্থ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে শিল্প সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ইত্যাদিতে সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু সেই গতানুগতিকতার ভাব বর্তমান। অথচ শিল্পী হিসাবে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাস্তব জীবনেও ব্রহ্মদেশবাসীরা একরূপ মরিয়া রহিয়াছে। তবে তাহাদের বাস্তব ও রাজনৈতিক জীবনে কিছু কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আজ আমাদের শিল্পসাহিত্য, ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতিতে নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে। যে জাতির মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির যে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। সৃজনী শক্তি না থাকিলে কোনো জাতিই এইরূপ মনীষীর জন্ম দিতে পারে না। জাতি যখন মরণের দশায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এই-সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন।

চিন্তা ও রক্তের সংমিশ্রণ

দুইরকম অবস্থায় বা দুই কারণে মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইয়া থাকে। একটা জীব-বৈজ্ঞানিক বা রক্ত-সংমিশ্রণের দিক হইতে, আর-একটা মানসিক বা চিন্তার দিক হইতে। যখনই দুইটি সম্প্রদায় বা দুইটি জাতি পরস্পর মিলিত হয়, তখনই উভয়ের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ এবং চিন্তার আদান-প্রদান হইয়া থাকে। মহাভারতের আমল হইতে ভারতবর্ষে এই রক্ত-সংমিশ্রণ

চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিভেদের অচলায়তন তখন ছিল না।. তারপর ঐতিহাসিক সম্বন্ধে হূন-শক-পাঠানের রক্ত মিশিয়া গিয়াছে। যখনই বাহিরের প্রবল আঘাতে এক-একটা জাতি আর টিকিতে পারে নাই তখনই বিভিন্ন রক্ত ও চিন্তার সংমিশ্রণে সে জাতি আবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। রোমক সভ্যতা সব চেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা যখন ধ্বংসোন্মুখ হয়, তখন বাহির হইতে গথিক ও অন্যান্য জাতি আসিয়া রোমের উপর আধিপত্য করে। ফলে তাহাদের সংমিশ্রণে রোমের সভ্যতা আবার বাঁচিয়া উঠে। এই যে ইউরোপে ধর্মজগতে পুনঃসংস্কার (Reformation) এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পুনর্জাগরণের (Renaissance) আন্দোলন— ইহারও মূলে ঐ বাহিরের সংমিশ্রণ।

ভারতের জাতিগঠন ও তরুণের দায়িত্ব

আজ আমাদেরও এই সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যদি জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে সে গুরু দায়িত্বের ভার তরুণের উপর। এখন আমাদের চিন্তার বিষয়, কি করিলে আমরা এই গুরু দায়িত্বের উপযুক্ত হইতে পারি। বর্তমান জগতে সকলেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ভার তরুণদল না লইলে আর রক্ষা নাই।

জার্মানী ও চীনে যুব-আন্দোলন

যুদ্ধের পর ইউরোপে যে-সমস্ত জাতির মধ্যে এই তরুণের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে রাশিয়া ও জার্মানী উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে যুব-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এখন সেখানে এই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চীন দেশেও এই আন্দোলন কতকটা আরম্ভ হইয়াছে। তবে তাহার বেশির ভাগ ছাত্র-সমাজে। আমাদের দেশে যুব-আন্দোলনের সহিত রাজনীতির যেমন সম্পর্ক, তাহাদের দেশেও সেইরূপ।

চিন্তার জগতে এবং রাজনৈতিক জগতে চীন এতদিন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া চীন দীর্ঘকাল পরে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে দুই দলের সৃষ্টি হয়। একদল কনফুসীয় দর্শনের মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। অপর দল তাহার বিপরীত পথে চীনকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে। তারপর ক্রমে সা[illegible]

হয়। আমাদের দেশে ইংরেজের আগমনকালে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন ঘটে। তার পর পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। ফলে সমন্বয় সাধিত হয়। চীনেও ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা—সবদিক দিয়াই সংস্কারের একটা প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। বহুদিনের ঘুমন্ত চীন আজ জাগিয়া উঠিতেছে। ছাত্রগণই এই আন্দোলন চালাইতেছে। এজন্য পঞ্চাশ খানি কাগজ বাহির হইয়াছে। ডা. সান-ইয়েৎ-সেন এই নূতন আন্দোলনের জন্মদাতা। অনেকে ইহার মধ্যে বলশেভিকবাদ আরোপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হয়তো এই আন্দোলনের কোনো কোনো দিক বলশেভিকবাদের অনুরূপ হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। ভারতের যুব-আন্দোলনেও আগাগোড়া এইরূপ একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই দিক দিয়া উভয় দেশের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত

আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন, এই বর্তমান আন্দোলন একটা হুজুক মাত্র, ইহার পিছনে কোনো সত্য নাই। ইহা বাহিরের আঘাতের একটা চাঞ্চল্য মাত্র। ইহার মধ্যে অন্তরের চৈতন্য নাই, ইত্যাদি। অনেকে এ কথাও বলেন, পাশ্চাত্য প্রভাব চলিয়া গেলে আমরা আমাদের অন্ধকার যুগে চলিয়া যাইব। আমাদের কোনো কর্মপ্রচেষ্টা থাকিবে না। সুতরাং ইংরেজ থাকিতে থাকিতেই আমাদের উন্নতি করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

ইংরেজ ও মুসলমানের প্রভাব

আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই আন্দোলনের ফলে জাতির জীবনে নিত্য-নূতন সৃষ্টি হইতেছে। বৌদ্ধযুগের আমল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চিরদিন নব নব সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। কাজেই ইংরেজ না আসিলেও ইহা ঘটিত। আমরা ইংরেজদের অনেক প্রভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি এ কথা সত্য, মুসলমানও এ দেশে আসাতে আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ

নূতনরূপ পাইয়াছে। বাহিরে হিন্দু ও মুসলমানে যতই বিরোধ থাকুক-না কেন, সমগ্র জাতির শিল্প-কলা-সাহিত্যের মধ্যে, জাতির অন্তরাত্মার মধ্যে একটা মৌলিক একতা আছে। সেখানে কোনো বিরোধ নাই। আজ ভারতের শিল্পের, ভারতের সংগীতের কোনো জাতিভেদ নাই। যুগের পর যুগ এইরূপ নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে, তাই জাতি বাঁচিয়া আছে।

তরুণের অমরত্ব ও সর্বজনীনতা

এই নূতন সৃষ্টির ভার তরুণের উপর। তরুণের কাজ নূতন সমাজ সৃষ্টি। সমাজ সৃষ্টি মানেই মানুষ সৃষ্টি— মানুষ লইয়াই সমাজ। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে চিন্তা ও কল্পনা-রাজ্যে সৃষ্টির প্রয়োজন— এই সৃষ্টির চেষ্টা সব কালে, সব দেশে তরুণের মধ্যে চলিয়াছে। তরুণ অমর, তরুণ চিরকাল বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিবে। তরুণের দেশ নাই, কাল নাই, জাতি নাই। তরুণ তরুণ-ই। তরুণকে কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। সে সর্বজনীন— আজ পৃথিবীর সমস্ত তরুণ সমাজ একইরূপ চিন্তা করে, প্রাণে প্রাণে একইরূপ অনুভব করে। সকল তরুণের হৃদয়তন্ত্রে একই সুর ধ্বনিত হয়। এই তরুণদের আজ জাতি গঠনের মহাসাধনায় মগ্ন হইতে হইবে।

তরুণের সাধনা

সাধনার অর্থ বনে জঙ্গলে গিয়া যোগ অভ্যাস করা নহে। আজ সাধনার ভিন্ন অর্থ। খাঁটি মানুষ তৈরি করা এখন কঠিন। খাঁটি মানুষ তৈয়ারি করিতে পারিলেই জাতি গড়িয়া উঠিবে।

যৌবনের প্রেরণা

সমগ্র জাতির মধ্যে যৌবনের প্রেরণা জাগাইতে হইবে। আজ যখন চারিদিকে তাকাই, সর্বত্র অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-দুর্দশা দেখিয়া শোকে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। শুধু ভাবি কিরূপে এই জাতিকে আমরা গড়িয়া তুলিব। তরুণের উপর এই মহান্ কাজের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। যাহার মধ্যে যৌবন নাই, সে নিরাশ হইবে, ভয় পাইবে। তরুণের কাজ বাস্তবকে অস্বীকার করা। তরুণকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। নিজের ও দেশের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ইহাই

সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহা আসিবে যদি আমরা সকলেই অন্তরের মধ্যে যৌবনের প্রেরণা অনুভব করি। আজ ক্রমেই এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে, যুবক, না বৃদ্ধ— তাহা নির্ধারিত হয় অন্তরের মমতা দ্বারা।

বয়সে কিছু বোঝা যায় না। যৌবনের এই অমর প্রেরণা ফিরিয়া পাইতে হইবে সাধনা দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কল্পনা দ্বারা। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র— সব দিক দিয়া জাতিকে গড়িয়া উঠাইতে হইবে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি একবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে তবে তাহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা দিবে। স্বাধীনতার এই আদর্শ চিন্তার দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, সাধনা দ্বারা মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার জন্য যৌবনের প্রয়োজন। যৌবন ব্যতীত এই চিন্তা, এই কল্পনা, এই স্বপ্ন অসম্ভব। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংরেজের অধীনে স্বাধীন হইব, এই চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি একবার প্রাণ স্পর্শ করে, একবার যদি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় তবে যে কোথা হইতে অসীম শক্তি অনুভূত হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা অবাক হইব। এইজন্য বাঙালীর ভাবপ্রবণতার একটা সার্থকতা আছে। এই পৃথিবীতে সকল শক্তির বড়ো শক্তি কল্পনা ও চিন্তা-শক্তি।

শক্তির উদ্‌বোধন

এদেশে কী না আছে? প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য; প্রতিভাবান কবি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়— কিসের অভাব আমাদের? শুধু প্রয়োজন শক্তির উদ্‌বোধনের। এইজন্য সাময়িক স্বৈরাচারের (autocracy) প্রয়োজন। নতুবা নিয়মানুবর্তিতা থাকে না। আর নিয়মানুবর্তিতা না থাকিলে শক্তির ও সংহতির উদ্‌বোধন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, তরুণেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। আমি তাঁহাদের প্রতিবাদ করি। তবে একটা আন্দোলন আরম্ভ হইলে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা না হইয়া যায় না। কিন্তু পরে ইহা থাকে না।

অমৃতের সন্তান

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের মধ্যে দেবত্ব আছে। কাজেই আমরা স্বাধীন হইলে উচ্ছৃঙ্খল হইব ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করি না। নেতৃত্বের পতন যখন-তখন হয়। তাহা না হইলে তরুণের আন্দোলন

জাগ্রত হয় না। একজনের পতন আর-একজনের সেখানে আগমন— আর পশ্চাতে সমাজ। তখনই বুঝিব জাতি জাগিতেছে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

আমার শেষ কথা, আপনাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি রহিয়াছে, তাহা অনুভব করুন। আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিতে হইবে; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। যেদিন জাতির মধ্যে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগরিত হইবে সেই দিনই আমাদের স্বরাজ আসিবে। এই সংকল্প জাগিলে ২৪ ঘণ্টাও ইংরেজ এ দেশে থাকিতে পারিবে না।

আমাদের জাতি বড়ো ছিল। আবার বড়ো হইবে। আমরা সকল রকমে বড়ো হইব, আমরা স্বাধীন হইব। তবেই আমরা বিশ্বসভ্যতায় স্থান পাইব।

জুলাই ১৯২৮

যৌবনই আশা

যৌবনের যথার্থ ধর্ম বুঝিতে হইলে আমাদের অতি অবশ্য প্রথম জানিতে হইবে যৌবন বলিতে কী বুঝায়। যৌবন এক অন্তহীন আশা। এক অফুরন্ত কর্মশক্তি এবং ব্যক্তির জীবনে সেই শক্তির বিকাশ। এই ভাবটি মাঝে মাঝে কবিতায়ও ভাষা পাইয়াছে যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায়— 'আমি ভাঙিব পাষাণ কারা' অথবা টেনিসনের 'ইউলিসিস' কবিতায় 'Strong in will / To strike, to seek, to find and not to yield.' এই অন্তহীন আশা বিশ্বজাগতিক শক্তির সৃজনী ক্ষমতার প্রেতিরই আর-এক নাম যৌবন। যৌবনের এই সৃজনীশক্তির অন্তরালে আছে মুক্তির পিপাসা। যত বড়ো সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে তাহার সহিত তাল মিলাইয়া মুক্তির পিপাসা তত বেশি হইবে।

এই যুব-আন্দোলন এবং এই যৌবনের প্রেরণা পৃথিবীর সকল দেশে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ; এখন তাহা একটি বিশ্ব আন্দোলনের বা বিশ্ব সমস্যার রূপ লইয়াছে।

মুক্তির পিপাসা

যখন পিপাসা জাগিয়া উঠে তখন একটি জাতির কর্মের সর্বক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ ঘটে। এই কর্ম এবং তাহার আনুষঙ্গিক সিদ্ধি প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ মানুষের অন্তরে মুক্তির পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বাণ এবং এই ধারণার ফলগুলি সংস্কৃতিতে সামগ্রিক এবং সুষম বিকাশ ঘটাইয়াছিল। এই বিকাশ ছিল আমাদের সভ্যতায় লক্ষণীয় ও গৌরবময়। তাহার পূর্বে প্রাচীন ভারতে আমরা সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর সামগ্রিক বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। তাহা ঘটিয়াছিল বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে। বেদে এবং উপনিষদে শুধু সাংস্কৃতিক বিকাশের চিহ্নই ছড়াইয়া নাই, তাহাতে উচ্চস্তরের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাও যে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।

একবার সভ্যতার উত্থান ঘটে, তারপর তাহার পালাবদলে পতন ঘটে—পৃথিবীর সর্বত্র, এমন যে একটি বিশ্বজনীন সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে তাহা ভারতের ইতিহাসেও সমর্থিত হয়।

মিশ্রন

একই ঘটনা পৃথিবীর অন্য অংশেও ঘটিয়াছিল। যেমন আসিরিয়া এবং মেসোপোটামিয়ার মতো সভ্যতাগুলি ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র মিশর, গ্রীস এবং রোমের সভ্যতাগুলি পরবর্তীকালে কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারি না। শুধুমাত্র ভারতে ও চীনে অতীত এবং বর্তমানের সাংস্কৃতিক বন্ধনসূত্রটি এখনো রহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বিপর্যয় সত্ত্বেও এই দুই সভ্যতা আজও বর্তমান। যাঁহাদের একটি বাণী ও ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, তাঁহারাই বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

একটি সমন্বয়

তাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আমরা কিভাবে বিপর্যয়গুলি অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারিব। গভীর সত্যটি হইতেছে বিনষ্টি যখনই আমাদের উপর আঘাত হানিয়াছে, তখনই আমরা একধরনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়কে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছি। মহাভারতে বেশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য আছে। এই মহাকাব্যে আমরা দেখি তখনকার প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথা সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়া রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

পরবর্তীকালে যখন শক, হূন, স্কাইথীয় এবং গ্রীকরা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের সমাজে মিশিয়া গিয়া বিলীন হইয়া গেলেন। এইভাবে তাঁহারা সমাজে নূতন রক্তধারা সঞ্চারিত করিলেন। যখন একটি জাতি তাহার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাইতে বসে, তখন এই ধরনের পারস্পরিক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই পাশ্চাত্য মত। এই মতটি ভারতীয় ইতিহাসের সাক্ষ্যে সমর্থিত হয়।

অবশ্য এই ধরনের মিশ্রণ বর্মীদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে ব্রহ্মদেশে আমরা এক ধরনের বিজাতীয় অ্যাংলো বর্মী পাইয়াছি।

এখন শুধু জৈবিক স্তরে নয়, তার সংগে সংগে চিন্তা ও অনুভূতির জগতেও এই ধরনের পারস্পরিক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য চিন্তার অভিঘাতেই শুধুমাত্র ভারতের নবজাগরণ ঘটিয়াছে। তাই পাশ্চাত্যের সংগে যোগ যখন ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন আমরা বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে তলাইয়া যাইব। কিন্তু এই কাল্পনিক বিনাশের ভয় সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। কেননা ভারতের নবজাগরণ মূলত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হইয়াছে। এই নবজাগরণ একটি ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া নয়। জনসাধারণের জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

যৌবনের ব্রত কি ? এই ব্রত নিশ্চয়ই স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানো। 'এই নূতন আদর্শের উপাসনা' যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আমাদের সেই আদর্শকে বরণ করিতে হইবে।

মানুষ গঠনের আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন : 'মানুষ তৈরি আমার ব্রত।' যখন একদল সত্যিকারের মানুষ তৈরি হইবে তখন স্বামীজীর মিশন এবং লক্ষ্য রূপায়িত হইবে। 'সত্যিকারের মানুষ তৈরির আদর্শ' প্লেটো তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। অতিমানব (সুপার ম্যান) সম্পর্কিত নীটশের ধারণা মন ও একই সংগে দেহের যাবতীয় বৃত্তির বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনাকে লক্ষ্য বলিয়া জানিয়াছিল। ধারণা প্রচলিত আছে যে শ্রীঅরবিন্দ জার্মান দার্শনিকের অনুরূপ আদর্শকে তাঁর লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

এই হইতেছে প্রথম ধাপ— আদর্শের অনুসন্ধান, মানুষ তৈরি ব্রত, অতিমানবের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ গঠনের পরে কথা উঠে— সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের এবং এজন্য জাতির সামনে একটি নূতন আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে। ভারতের জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে পুনর্গঠন চাই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা জাতির মধ্যে জাগা চাই। জীবনে একটি নূতন বাঁক আনিতেই হইবে।

অভিযাত্রীর অভিলাষ

জনসাধারণের মধ্যে অভিযাত্রীর ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এমন ভাবই ইংরেজকে ভারতের সন্ধানে বাহির হইতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। আর

ভারত শেষ পর্যন্ত ইংরেজের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে আসিল। এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পদচিহ্ন-আঁকার উদ্যমে এই ভাবই গতিসঞ্চার করে। এমন উদ্যম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং শরীরকে বলিষ্ঠ করে।

পরবর্তী ধাপ হইতেছে সংগঠন। সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কারের সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর বিকাশ এবং নারীশিক্ষা যুক্ত হইয়া আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তন আনা চাই।

বহির্বিশ্বে মৌলিক পরিবর্তন

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক বা দুই দশকে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। আমাদের উদ্যমের সঙ্গে স্বাধীনতার আন্তরিক ইচ্ছা যুক্ত হইলেই এই পরিবর্তন সম্ভব। তুরস্কে কামাল, ইতালিতে মুসোলিনী, মিশরে সারগুয়াত, পারস্যে রেজাশাহ্ পহ্লবী সেই-সব দেশে এই পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। এ কথা সত্য যে তাঁহারা সমগ্রদেশের সমর্থন পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের পিছনে নিশ্চয়ই সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন ছিল।

এই নূতন আদর্শের ঢেউ আমাদের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আমাদের অতি অবশ্যই এখন জাগিয়া উঠিতে হইবে।

বাস্তব অবস্থার ঊর্ধ্বে আমাদের উঠিতে হইবে এবং আদর্শে পৌঁছানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। বাস্তবের কারাপ্রাচীরের মধ্যে হইতে আমাদের বাস্তবকে অস্বীকার করিতে হইবে এবং আদর্শকে বরণ করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অমর যৌবনের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল যখন তিনি অর্জুনকে ক্লীবতা পরিহারের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ভারতের বর্তমান অবস্থায় সকলকে বারবার বুঝাইতে হইবে যে একটি আদর্শের জন্য আমাদের উন্মাদ হওয়া চাই। সাময়িক উন্মত্ততা যদি একজনকে পাইয়া না বসে তাহা হইলে কোনো মানুষের পক্ষেই মহান হওয়া সম্ভব নয়।

যখনই আদর্শ সত্য হইয়া উঠে, বাস্তব মায়া মরীচিকা মনে হইতে থাকে; তখনই একমাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইতে পারে।

জুলাই ১৯২৮

সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত

হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল। আপনারা আমাকে এই তরুণ পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি।

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারাপ্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছিল যে কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্দৈববশত আমরা যেন আপাতত বড়ো কথা ভাবিবার এবং দূরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে সত্য মনে করিয়া, আসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সাময়িক মোহ ভাঙিতেছে; আমরা আমাদের সহজ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্মপ্রত্যয় জন্মিতেছে। সে বুঝিতেছে— জীবনে তাহার উপর কত বড়ো দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে, সে উপলব্ধি করিতেছে যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ সমাজ আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইতেছে। সর্বদেশে সর্বকালে যে মৃত্যুঞ্জয় তরুণশক্তি মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণ-শক্তিই নিজের অস্থিদান করিয়া বজ্র নির্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটি অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়— তাই আমি সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুত্থান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইয়াছে। আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম। ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে,

যুদ্ধবিগ্রহে— ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কালের চক্রবৎ পরিবর্তনের সংগে সংগে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়— বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের বিষয় এই যে অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইতেছি।

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে— এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহ্যিক চাঞ্চল্য-মাত্র নয়— ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও অভিব্যক্তি। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে নব জাগরণের সংগে সংগে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ; কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে— নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে— তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা জাগিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার নূতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কোনো সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে থাকে, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে adventure ও enterprise-এর স্পৃহা হ্রাস পায়, কতকগুলি বাঁধা বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যে বড়ো রকমের ওলট-পালটের প্রয়োজন এবং জৈব-রাজ্যে (biological plane) রক্ত-মিশ্রণ আবশ্যক। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নূতন সভ্যতা-সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাতির সহিত ভারত-বাসীর রক্ত-সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশি হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে— বিশেষত হিন্দু সমাজের মধ্যে— যে-সব জাতি আছে— তাহাদের মধ্যে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভালো হইতে পারে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে, তম্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন-- এ কথা আমরা কার্যত স্বীকার করিতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা বা initiative-এর অভাবের দরুন, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাব-দৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না— এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মত ও কর্মপ্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা— Socialism State Socialism, Guild Socialism Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy, Aristocracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি। এই-সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। প্রথমত, সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনো কোনো মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসংগত কাজ নয়; দ্বিতীয়ত, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনো দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্যদেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

আপনারা জানেন যে, Marxism-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রাশিয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রাশিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— তাহার সহিত Marxian Socialism-এর মিল যতটা আছে— পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রাশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে— কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ-সব কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।

আর-একটি কথার উল্লেখ না করিলে আসল কথাই বলা হইবে না। পরাধীন দেশে যদি কোনো 'ism'— সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা nationalism। যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Social and Economic) পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাইব না, এ কথা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত চেষ্টায় স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়— এবং কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী শ্রমিক, কী ধনিক— কোনো সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে ; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এইজন্য আমি সংঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ আন্দোলনের পরিপন্থী তো মনে করিই না— বরং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র— এবং তাহারা

যে পর্যন্ত সংঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না। এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষত আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়— গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় গঠন-মূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত তাহাদের ভাবের অভাবের কথা। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই ভাব-দৈন্যের কারণ কি? কারণ এই যে, যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন করেন না। আমাদের ভাব-দৈন্যের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধানত দায়ী করি। আমি জিজ্ঞাসা করি— আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা ঐ আঙিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাগরণের বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন— ফরাসী দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন— তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন— তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।

ভাবের দৈন্যের পরই অন্নাভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে

আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার চেয়ে অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকুরির দ্বারা যে তাহাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা চাকুরির সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবার্য যে আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমরা যদি চাকুরির আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এখনো যদি আমরা চাকুরির আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তো মরিবই— সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মরণের আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের মারোয়াড়ী ভাইরা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আমাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখন দুই দিকে কাজ করিতে হইবে। প্রথমত, ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক-সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্মী এই League-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাঁহারা 'best brain of the entire nation' তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে— তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, যুবকদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পর-বিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংহত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা। এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সমিতির কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আজ ঐ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় আসিয়াছে। কোনো নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন না করিয়া আপনারা যদি ঐ পুরাতন নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বিস্তৃত কর্মতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব না। কি আদর্শ লইয়া এবং কি প্রণালীতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু বলিলেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব প্রধানত তিন প্রকার— ১. অন্নাদির অভাব, ২. বস্ত্রাদির অভাব ও ৩. শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ— ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National Will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent Despot-এর মতো সরকার বাহাদুর অথবা Local Body-রা যদি জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানত নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ফিরিয়া আসিবে— এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লী-সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা-উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানত নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লী-

বাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লী-সংস্কারের কোনো সার্থকতা হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।

আজকাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমতো এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সংপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত কিন্তু সংগে সংগে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন। গবেষণা আরম্ভ করিলে একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি না। কিন্তু তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার। আমি সকল চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে-সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম ও লোকাচারের নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় যে শুধু বিবাহ কেন— আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা যে বাপ মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন— এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যুবকেরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার ভাই ও ভগিনী সকল! আজিকার মতো আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। মনে রাখিবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম ও শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে, জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি

সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে— শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু, আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন— আপনারা আসুন— মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে— দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

ডিসেম্বর ১৯২৮

তরুণের জাগরণ

নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই বৎসর কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, দেশের যুব-আন্দোলন ধীরে ধীরে নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতেছে। অনেকে হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বদল মহাসম্মেলনের সহিত একই সময়ে এই কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহার কার্যকারিতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, যুব-কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই খর্ব করিতে পারিবে না। আমাদের জীবনযাত্রার পথে অনেক রাজনৈতিক সমস্যা আছে— আমি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা কম বলিতেছি না কিন্তু যুবকদের নিকট যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আরো গুরুতর। আমাদের বর্তমান জীবনে যে-সকল গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এই কংগ্রেস হইতে নিশ্চয়ই তাহার সমাধানের পন্থা নির্দিষ্ট হইবে। যুবকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর; সুতরাং এই কংগ্রেসের কার্য যে বিশেষ ধীরতার সহিত পরিচালিত হইবে তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সুতরাং এরূপ গুরুতর স্থলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সম্বর্ধনা করিবার ভার পাইয়া আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করিতেছি।

দেশ হইতে বাহির হইয়া বিশ্বের দিকে চাহিলে প্রত্যেক দেশে একই দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িবে এবং তাহা তরুণের জাগরণ। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে, যে দিকেই তাকাই-না কেন সে দিকেই যুব-আন্দোলনের প্রধান উৎস কোথায় এবং ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

তরুণ তরুণীদের যে-কোনো সমিতিকে যুব-সমিতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কোনো সমাজ-সংস্কার সংঘ বা দুর্ভিক্ষ-সাহায্য সমিতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুব-সমিতি বলা যায় না। বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং তাহার দূরীকরণের চেষ্টার ফলে যে যুব-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহাকেই বাস্তবিক যুব-সমিতি

নাম দেওয়া যায়। যুব-আন্দোলন শুধু সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, উহা পুরাতনকে ভাঙিয়া চুরিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করে। যুব-আন্দোলনের সৃষ্টির পূর্বে চাই বর্তমান অবস্থাজনিত একটা চাঞ্চল্য, একটা অধৈর্যের ভাব। আজিকার যুব-আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর বা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্টি নহে। এইরূপ আন্দোলন প্রতি যুগে প্রতিদেশেই হইয়াছে। সক্রেটিস ও বুদ্ধের সময় হইতে মানব-সমাজ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগে যুগে সমাজকে নূতনভাবে গড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যুগের যুব-আন্দোলনের মূলেও ঠিক সেই আদর্শ ও চেষ্টা আছে। রুশিয়ার বলশেভিকবাদ, ইটালীর ফ্যাসিস্ট আন্দোলন কিংবা তুরস্কের তরুণ আন্দোলন অথবা চীন, পারস্য বা জার্মানীর তরুণ আন্দোলন, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করুন-না কেন সর্বত্রই এক মনোভাব, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত দেখিবেন। যেখানেই প্রাচীন নেতাদের নির্দিষ্ট পথ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই সেইখানেই যুবকরা সমাজকে নূতন ভাবে গড়িয়া উহাকে নব কলেবর দান করিয়াছে।

শুধু যে জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী, চীন পারস্য ও আফগানিস্তানের যুবকরা জাগিযাছে তাহা নহে। আমাদের দেশে স্বপ্নবিলাসীদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিযাছে। এই জাগরণ শুধু বাহিরের জাগরণ নহে, ইহা প্রাণের জাগবণ। ভারতের যুব-সম্প্রদায় প্রাচীন নেতাদের প্রতি নির্ভরশীল হইযা এখন আর অন্ধভাবে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে রাজী নহে। তাহারা ইহা বেশ বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগকেই নতুন ভারত গড়িতে হইবে, তাহাদিগকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে হইবে। তাহারা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ ও ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতেছে। এই সংকট মুহূর্তে ভারতের শুভকামী সকলেরই এই আন্দোলন সম্বন্ধে নির্ভয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ করা উচিত। আন্দোলনের দোষগুণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। আমি আজ দেশের মধ্যে দুইটি আন্দোলন বা দুইটি দেশের চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই বিষয়ে আমি যে দুইটি চিন্তাধারার উল্লেখ করিলাম তাহার একটি সবরমতী ও অপরটি পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত। দুই চিন্তাধারার মূলে দার্শনিকতা কতখানি আছে এ স্থলে আমি তাহার আলোচনা করিব না। আমি সংসারের লোকের মতো বাস্তবিক কার্যকারিতার দিক হইতে উহাদের কতটা মূল্য আছে এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

সবরমতী চিন্তাধারা

সবরমতী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, আধুনিক যাহা-কিছু সব মন্দ, অধিক পরিমাণ কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অশুভজনক, অভাব ও জীবিকানির্বাহের মান বাড়ানো উচিত নহে, আমাদিগকে আবার গো-যানের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চা ও সামরিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে হইবে।

পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারা

পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান, অনেক সৎকার্য থাকিলেও ঐরূপে যোগ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য দ্বারাই মাত্র বর্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। প্রকৃতিকে জয় করিতে হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে ; এবং চারিদিক হইতে আমরা যেরূপভাবে বিপদ-জালে জড়িত, তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্বলতামাত্র। এই চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের এই দেশে যোগী, ঋষি বা আশ্রমের প্রবর্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে। আমাদের যোগী ঋষিদের আদর চিরকালই থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে চাই, যদি ভারতকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাই তাহা হইলে তাহাদের পন্থায় চলিলে হইবে না। এই সত্য কথা বলিতে যাইয়া যদি আপনাদের মনে আমি কোনোরূপে আঘাত করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে মার্জনা করিবেন। ঐ দুই চিন্তাধারার মূলে যে দার্শনিক ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আমি এখানে উহার আলোচনা করিতেছি না। আমি বাস্তবতার দিক হইতেই উহাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলাম। আমরা এখন ভারতবর্ষে চাই প্রবল কর্মবাদ। আমাদিগকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক যুগের সহিত মিলমিশ করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা আর এখন পৃথিবীর একপ্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে তাহার আধুনিক শত্রুর সহিত

আধুনিক উপায়ে সংগ্রাম করিতে হইবে— রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিকেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। গো-যানের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং তাহা আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সমগ্র পৃথিবীতে আন্তরিক ভাবে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হইবে ততদিন ভারতবর্ষকে আধুনিকভাবে সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। দর্শন, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের শিখাইবার অনেক জিনিস আছে। এককথায় আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সকল জাতির মধ্যে এই কার্য করিবার যোগ্যতা আমাদের অধিক আছে। আমাদের দেশের মনীষী ও কর্মীগণের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যেই গুরুতর কার্য আরম্ভ করিয়াছেন! আমাদিগকে একদিকে যেমন "বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাও" চীৎকারে বাধা দিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশূন্য পরিবর্তনের বিরোধিতাও করিতে হইবে।

দেশের কোনো স্থানেই তরুণ-আন্দোলন যাহাতে কেবল মাত্র পরামর্শ এবং আলোচনার মধ্যে নিবদ্ধ না থাকে সে বিষয়ে আমাদের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এবং প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিলে তাহার ফলে শুধু একটি বিতর্ক-সমিতি গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য ইহাতে দেশের রাজনৈতিক জীবন আরো প্রেরণা লাভ করিবে। কিন্তু শুধু বিতর্ক-সভা থাকিলেই চলিবে না। যুবকদের অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদিগকে সমস্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। এইভাবেই আজ বোম্বাইয়ের যুব-আন্দোলন এত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরো একটি বিষয়ে আমি যুবকগণকে সতর্ক করিয়া দিব। অনেক সময় কোনো আন্দোলনের প্রারম্ভে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই নবজাগ্রত উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায় মিলাইয়া যায়, আলস্য এবং জড়তা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আন্দোলনের সমস্ত প্রাণ এবং শক্তি নষ্ট

হইয়া যায়। আমি আশা করি, আমাদের তরুণ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এরূপ হইবে না।

বিশ্বব্যাপী তরুণ-আন্দোলন আজ পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। এশিয়া এবং ইউরোপের সমস্ত দেশেই রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লবে যুবকগণ চিরদিনই এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুত্থান, আয়ার্ল্যান্ডের রাজনৈতিক মুক্তি, মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইটালীর ফ্যাসিস্ট আন্দোলন, আফগানিস্তান এবং তুরস্কের নবজাগরণ, চীনের পুনরুত্থান— সমস্তই ঐ-সব দেশের তরুণ আন্দোলনের ফলে সম্ভব হইয়াছে।

আবার মনে হয়, যে-সব দেশ ইতিপূর্বে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই-সব দেশ অপেক্ষা বৈদেশিক প্রভুত্বাধীন-জর্জরিত ভারতবর্ষেই তরুণ-আন্দোলনের প্রয়োজন বেশি।

বোম্বাই প্রাদেশিক যুব-সংঘের সভাপতি রূপে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে আমি গর্বের সহিত এই মত পোষণ করি যে এদেশের যুবক পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের যুবক অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্য দেশের যুবকের ন্যায় ভারতের যুবকও কর্তব্যনিষ্ঠা, অবিচল স্বদেশপ্রেম, সাহস, আত্মত্যাগ এবং সর্বোপরি স্বাধীন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মহৎ গুণে ভূষিত। ভারতের যুব-আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এখন যে জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন তাহা এই : একটি উপযুক্ত সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, একজন সাহসী বীর ও নিঃস্বার্থ নেতা এবং সর্বোপরি বর্তমান মানসিক দৃষ্টি এবং দূষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন।

দীর্ঘদিন যাবৎ বৈদেশিক শাসনের ফলে জাতির মানসিক ও শারীরিক এবং নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আজ ভারতেরও এই অবস্থা হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের ফলে যে কেবল এই বিশিষ্ট সভ্যতাসম্পন্ন প্রধান জাতিরই সর্বপ্রকার অধঃপতন হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষময় ফল সমগ্র বিশ্বমানব-সমাজের উপরে গিয়াও পড়িয়াছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতেই গভর্নমেন্ট এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এ দেশের

লোককে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া, অর্থাৎ, তাহাদের নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ দেশহিতৈষী অথবা উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তোলা গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। লর্ড মেকলের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু সরকারী চাকুরি করিবার জন্য কতকগুলি কেরানী সৃষ্টি করা।

প্রত্যেক সভ্য দেশেরই শিক্ষার আদর্শ দ্বিবিধ— একটি জীবিকা অর্জন, অন্যটি চরিত্র গঠন। কিন্তু এ দেশে শিক্ষার এই দ্বিতীয় দিকটি শুধু উপেক্ষিতই হয় না, পরন্তু এদিকে কোনো উৎসাহই প্রদান করা হয় না। এ দেশের শিশুগণ প্রথম হইতেই এই শিক্ষালাভ করে যে ভারতের প্রতি ইংরেজ রাজাদের দয়া অসীম, তাঁহারা এ দেশে সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছেন, এবং যদি তাঁহারা এ দেশকে রক্ষা না করেন তবে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। প্রথম হইতেই শিশুর এই ধারণা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের সুফলের জন্য আমাদের ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এবং সে মনে মনে এই আশঙ্কা পোষণ করে যে এই রাজত্ব যেন চিরকাল বজায় থাকে, কেননা ইহা না থাকিলে দেশের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা কিছুই থাকিবে না।

সমস্ত পাঠ্য পুস্তকই এই ধরনের অর্থহীন বাজে কথায় পরিপূর্ণ থাকে। বেচারা শিক্ষক ছাত্রগণকে এই শিক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি যাহা শিক্ষা দেন তাহার একটি কথাও বিশ্বাস করেন না; সম্ভবত, তিনি তাঁহার দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কিন্তু কী করিবেন তাঁহার কোনো উপায় নাই। হয় তাঁহাকে এই বিশ্রী কাজ লইতে হইবে, নতুবা চাকুরি হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। এইভাবে ভারতীয় শিশুকে তাহার ছাত্রজীবন আরম্ভ করিতে হয় এবং এই অনিষ্ট তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া পর্যন্ত চলে।

ডিসেম্বর ১৯২৮

তরুণ প্রাণের লক্ষণ

পাবনা জেলার যুব-সম্মিলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কখনো হয় নাই, যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাংলার জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জেলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিবেন।

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কী দেখিতে পাই ?— দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন— জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নবসৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিযা সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতেছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজ নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা নয়, ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিযাছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" তখন তাঁহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম "The voice of Krishna was the voice of immortal Youth"। ধ্বংসের করাল মূর্তি দেখিয়া অর্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধ্বংস বিনা সৃষ্টি

হইতে পারে না ; তাই শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি ? তরুণের আদর্শ— বর্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান— যেমন সেবাসমিতি, যুবক সমিতি বা তরুণ সংঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি ?— লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে আনিতে চায় ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব-সৃষ্টিরূপ কার্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্‌ জরসা বিনা।"

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের মতো সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে— এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মতো কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ কোনো গোলমাল সৃষ্টি হয় নাই ; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্তব্যভার

অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কি-তরুণেরা নব্য তুর্কিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদবর্গ যখন সেনাপতিকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না— বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্মানেরা দেখিল যে তাঁহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল, তখন জার্মানীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য, বীর্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ এই— ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত মনে করিয়া থাকেন যে, যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র— কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া ওঠে। শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য— সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে— ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনো রূপটি হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য।

যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া ইহা non-

political নয় ; রাজনীতি বর্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে জাতীয় আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এ-সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এ-সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে পারে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা তরুণ সমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ-সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা 'Ism') প্রচলিত আছে যথা— Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism, Republicanism, Constitutional monarchy, Fascism ইত্যাদি। এক-একটি "ism"-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনো কোনো দেশে "ism"-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনো ism-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন— man-making is my mission— মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি— খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে যুব-আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্র-বাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা— সেই সমস্যার সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে— আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য— বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষে

মানুষে যে ভাইয়ের সম্বন্ধ— এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আত্মস্থ তরুণ-জাতি অনুভব করিতেছে যে সব দেশে ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলত একই। বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্মা-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পেঁছিবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্বলিত আছে তাহা যদি নির্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের যথেষ্ট প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে কূট রাজনীতি-বিদদের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মতো। কামান-বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্মবলিদান করিতে হইবে— অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনো জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃংখলিত ও পরপদদলিত। যে পর্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত শান্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোনোদিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়— তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপনা করিবে।

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ-বিদেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্বদেশে ও সর্বযুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্ত-র্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন এ কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে

করিতে পারি যে প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে বিধির কোনো বিধান নাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম মৃত্যু বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কখনো জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনো-বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মতো কোনো প্রকারে জীবনধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান্ সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি এ-কথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারত-ভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়তো এই সংমিশ্রণের দরুনই ভারতীয় জাতি ও ভারতের সভ্যতা বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বুকে বাস করিতেছে।

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক-না কেন, এ-কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন সভ্যতা ও শিক্ষার (culture) সংঘর্ষের দরুন চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরেজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তাজগতে একটা বড়ো রকমের ওলটপালট হইয়াছিল। ইহা বর্তমান যুগের নব জাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন

অবস্থার তুলনা করিয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখিতে শিখিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই স্বপ্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একদিকে আছে অসন্তোষ, আর-এক দিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ।

কোন্ মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না ; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ইজম্ আপনি গ্রহণ করুন-না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে কার্ল মার্কসের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মার্কসের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের ধারণা আছে যে Socialism অথবা Republicanism বুঝি-বা পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই-সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়— ইহা বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সংকল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশা আমি করি না। কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি-না কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টিকার্য কখনো সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন ? আছে তো সবই— প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি— এর কোনোটির তো অভাব নাই ; এ-সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা

করিতে পারি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায় ? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন— যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সে-ই 'জাতীয় যজ্ঞে'র পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শত-সহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক !

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু— নিঃশেষে আত্মবলিদান— বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইংরেজের আছে— তাই ইংরেজ এত বড়ো আর আমরা এত হীন, আমরা অন্তরের সংগে দেশকে ভালোবাসি না, স্বজাতিকে ভালোবাসি না তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মীরজাফর উমিচাঁদ। মীরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই— এখনো তাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালোবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল— tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব ? বনে জংগলে যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে— অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে, ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে— সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শক্তি পূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হত তবে চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভু হত না।

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এইভাবে :

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মতো চলিতে শিখিব।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

আমরা কী করতে পারি

আজ উৎসব উপলক্ষে আপনারা যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেজন্য আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে এই বেহালায় এলেও কোনো সভায় যোগদান করবার, সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হবার কোনো সুযোগ ঘটে নি, তাই আজ সানন্দে আপনাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। সকলের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আনন্দলাভ করেছি।

দেশে আজ অসংখ্য সমিতি গড়ে উঠেছে। সকলেই এইভাবের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। এই কাজ যে কত বড়ো, কত বিরাট তা দেশের অবস্থা একটু চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনাদের কাজ দেখে আনন্দ ও আশা পাওয়ার অনেক কিছুই আছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কাজ করেছেন, তা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য। তবে এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, যে আরো বেশি চেষ্টা করলে আরো বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কার্যাবলী দেখে বোঝা যাচ্ছে, একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইরকম সর্বতোমুখী কাজ একযোগে আরম্ভ করা সত্যই আনন্দের বিষয়, আর এই-ই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। মানুষের সকল অভাব, সকল দিক দিয়ে দূর করবার জন্য সর্বাঙ্গীণভাবে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। আমরা সাধারণত ভাবি মুষ্টিভিক্ষা বা অর্থভিক্ষা দ্বারা সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এইটুকু ভাবলেই চলবে না। দেখা উচিত আমাদের উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য— অভাব মোচন। কিন্তু অভাব কি ? অভাব— অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। একযোগে এই অভাব দূর করবার চেষ্টা না হলে, সবই ব্যর্থ হবে। আনন্দের কথা, আপনাদের এখানে, মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরো নানাভাবের কার্য আরম্ভ করা হয়েছে।

একটা কথা বলতে চাই, এ পর্যন্ত সেবাসমিতিগুলি যেভাবে কাজ করে এসেছে, ঠিক সেইভাবে কাজ করলে চলবে না। এই যে অন্নাভাব, এটা কি করে দূর হবে ? প্রতি সপ্তাহে অন্ন অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সে ভালো কথা। কিন্তু দেখা দরকার, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তারা কোনোদিন স্বাবলম্বী হবে কিনা। সাহায্যপ্রার্থী ছাত্রই হোক বিধবাই হোক— তাকে স্বাবলম্বী করার

দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আপাতত কজনের দুঃখ ভিক্ষা করে দূর করলেও দারিদ্র্য এ'ত দূর হবে না।

দারিদ্র্য দূর করবার উপায় কি— তাই দেখা উচিত। ১৯২২ সালে বন্যায় উত্তর বাংলা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্য— তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সারা বাংলায় বিপুল চেষ্টা হয়েছিল। তাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— এই বাংলাদেশে বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ, বন্যা দেখা দিচ্ছে। দেশবাসী বিপন্ন হচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিকার কী, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। তাঁর কথার মর্ম অনেকদিন পরে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। জাতির মধ্যে— তার কর্মে ও চিন্তায় এমন একটা নিশ্চেষ্টভাব এসেছে, যাতে আমরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই না। বন্যা কেন হয়, সেটা অনুসন্ধান না করে শুধু দুঃখ মোচন করতে অগ্রসর হলেই কাজের সমাধান হবে না। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। প্রকৃত সেবক হতে হলে দেখতে হবে, এ দুঃখের কারণ কি, আর কিভাবে সেটা দূর করা যায়! যদি কারণ নির্ধারণ করতে সক্ষম না হই, তবে ফলে কিছুই লাভ করা যায় না।

যারা সমিতির সাহায্য গ্রহণ করে তাদের দিয়ে ঠোঙা তৈরি, সুতো কাটা এমনি ভাবের নানা কাজ করিয়ে নিতে হবে। কুটিরশিল্পের এতে বিশেষ উন্নতি হয়। অন্যদেশে দেশলাই-এর কাঠি, কাগজ প্রভৃতি ঘরে ঘরে দিয়ে আসা হয়, তারা অবসর সময়ে সেগুলি তৈয়ারি করে। সুইজারল্যান্ডে এই ভাবে আলপিন তৈয়ারি হয়। আমাদের দেশে ও ঢাকার গ্রামে গ্রামে কুটির-শিল্পের সাহায্যে বোতাম প্রস্তুত হয়। এইভাবে অবসর সময়ে কাজ করে লোকে আয়বৃদ্ধি করতে পারে। প্রত্যেক সমিতিরও এই বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার। এতে সমিতিরও আয় হয়, আর যারা সমিতির সাহায্য গ্রহণ করে, তারাও ভাবতে পারে যে তারা খেটে খাচ্ছে, তাদের মনের কুণ্ঠা দূর হতে পারে। অলস থাকলে, পরানুগ্রহে জীবন ধারণ করলে, মনুষ্যত্বের অপমান করা হয়। Dignity of labour বলে একটি কথা আছে। সত্যই এ একটা সম্মানের জিনিস। এই মনোভাব দেশের মধ্যে সৃষ্টি করা দরকার।

একটি কথা শুনে সুখী হলুম যে, জলসত্রের ব্যবস্থা করে আপনারা মেলার সময় কাজ করে থাকেন। এই-সব মেলা হচ্ছে কাজ করবার একটা মস্ত সুযোগ— উপযুক্ত ক্ষেত্র। দেশের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হলে, এই-সব

জেলাতেই তার আয়োজন করা দরকার। দেশ-বিদেশ থেকে, কত ভাবের কত লোকেরই না একত্রে সমাবেশ হয়— দেশের লোককে শিক্ষা দিতে হলে এর চেয়ে আর কি সুযোগ পাওয়া যেতে পারে? এখানে Lantern lecture, যাত্রা প্রভৃতি দ্বারা সমাজে সংশিক্ষা দেওয়া যায়। Propaganda করবার এই একটা মস্ত সুযোগ। তবে, যে দেশে কাজ করতে হবে, সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা দরকার। আজকাল মেলাস্থলে সুশিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত থাকে না। কুশিক্ষাই বরং লাভ করবার সুযোগ পাওয়ায় জীবন কলুষিত হয়ে ওঠে। এই-সব ভার আমাদের নিতে হবে। মেলার এই বিবিধ লোকের মিলনের অপব্যবহার না হয়ে যাতে সংশিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই মেলাই হচ্ছে, আমাদের দেশোপযোগী শিক্ষার প্রকৃত বাহন। অন্য দেশে অন্য রকম ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে এই মেলাকেই প্রকৃত সুযোগে পরিণত করতে, প্রকৃত ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে।

অভাবগ্রস্তকে বস্ত্রাদি দান খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু এই বস্ত্র বাজারে না কিনে যদি সুতা কেটে, তাঁত রেখে কাপড় বুনিয়ে বিতরণ করা যায়, তবে আনন্দ আরো বেশি হয়। আর যারা এই কাজ করে তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয়। এইভাবে তাঁতেরও বিস্তারলাভ হতে পারে। নানা কারণে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তারপর রোগ-পরিচর্যা— রোগীর সেবা-শুশ্রূষা— এ খুব বড়ো কাজ। কিন্তু কাজটা সার্থক করতে হলে, এমন কাজের সূচনা করতে হবে, যাতে রোগের নিবারণ হয়, সাধারণের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এ-বিষয়ে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করতে হবে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কী— কী ভাবে এই-সব রোগ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোক-চিত্র সাহায্যে তা ঘরে ঘরে জানানো প্রয়োজন। আর এভাবে কাজ না করলে সেবাকার্য সার্থক হবে না। রোগকে অবিরত সেবা করে পারা যায় না। Health propaganda করা দরকার। আজকাল চারিদিকে প্রায়ই Health Exhibition হচ্ছে, তারই সাহায্যে বক্তৃতা দিতে পারলে খুব কার্যকরী হয়। এইভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা বিশেষ দরকার। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ব্যায়াম-চর্চা। আজকাল শিক্ষিত যুবকদের, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দেখলে মনে ভয় হয়, কি করে এরা জীবনযাত্রার সংগ্রামে জয়ী হয়! শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার,

যাতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলে শরীর ও মনের পূর্ণ শক্তি থাকবে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে তা ঘটে না। আমরা কী মনে, কী শরীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ি, তাই সব বিষয়েই আমরা পশ্চাৎপদ।

আজকাল অধিকাংশ সমিতিতে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়। লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা সব শেখানো হয়। বার্ষিক উৎসবে তার নৈপুণ্যও দেখানো হয়। এইভাবে ব্যায়ামের ফলে ছেলেরা সাহসী, শক্তিশালী হয়। বাজারে ভালো খাদ্যের অভাবে ছেলেমেয়েরা নির্জীব হয়ে পড়ছে— এই কারণে ব্যায়াম-চর্চা বিশেষ প্রয়োজন। দরিদ্র হলেও, ব্যায়ামের পক্ষে কোনো অন্তরায় ঘটে না। ব্যায়ামের ফলে আমরা রোগের সঙ্গে যুঝতে পারব, শুধু তাই নয়, রোগ থেকে মুক্তও হতে পারব। বাংলার চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখছি, অনেক জেলা এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়েছে, এমনভাবে মৃত্যুহার বেড়ে চলেছে যাতে মনে হয়, একশো বৎসর পরে দেশে আর মানুষ থাকবে না। দশ লক্ষের মধ্যে এক লক্ষ লোক এক বৎসরে মরে কেন? এর প্রতিকার সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে না থাকলেও যতটুকু আমাদের হাতে আছে, তা করতে হবে, এইজন্য ব্যায়াম শিক্ষা করা দরকার।

গ্রামে অগ্নিকাণ্ডেও ছেলেরা যে কাজ করেছে এ খুব আনন্দের কথা। এ-বিষয়েও fire drill শিক্ষা করা দরকার। এই শিক্ষা পেলে বেশ যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারা যায়, কোনো গোলমাল ঘটে না। অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায়ই সাধারণ লোকে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে। যারা কাজ করতে যায়, তারাও এই গোলমালে কাজ করার সুযোগ পায় না। এই কারণেই এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন যাতে গোলমালের মধ্য হতেও কাজ করবার মতো সুযোগ আবিষ্কার করা যেতে পারে।

তারপর First Aid শিক্ষার ব্যবস্থা। হাসপাতালে যাঁরা কাজ করে, তাঁদের মধ্যে এক-একজন বেশ প্রিয় পটু বলে মনে হয়। আবার কেউ-বা অপ্রীতিকর বিরাগভাজন বলে মনে হয়। রোগের সময় ঔষধ চাই, কিন্তু পরিচর্যা তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। রোগীকে মিষ্ট কথায় ভোলানো, তাকে শান্ত করা বেশ শক্ত কাজ। ব্যান্ডেজ বাঁধা প্রভৃতি ব্যাপার শিক্ষা করা উচিত— সঙ্গে সঙ্গে শেখানো উচিত, সেবকের মনোভাব create করা। সম্ভবপর হলে, এ বিষয়ে উপযুক্ত 'ট্রেনিং' দিতে পারলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, ভালো 'নার্স' তৈরি করতে পারা যায়।

সংগীতের ব্যবস্থা দেখে বলতে হয়, এই কাজটা এখন খুব বেশি প্রয়োজনীয়। এমন একটা সময় ছিল, এমন মনোভাব আমাদের দেশে এসেছিল, যখন এর চর্চাটা সময় নষ্ট বলে বিবেচিত হত। এর অনাদরের ফলে, আমরা অমানুষ হয়ে পড়েছিলুম। ব্যায়াম যেমন শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সংগীত তেমনি মনের পক্ষে। একমাত্র জাতীয় সংগীতই সারা বাংলাকে স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ আমরা বুঝেছি, সংগীত কত আদরের হওয়া উচিত। এর শিক্ষার একটা আয়োজন করতে হবে। সমাজে যাতে এর আদর হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকের ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। শুধু বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হলেই পুরুষার্থ লাভ হয়, অন্য বিষয়ে প্রশংসা লাভের মূল্য নেই— এই ছিল এতদিনকার ধারণা। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, জীবন-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করে, শুধু বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নয়, সবদিক দিয়ে মানুষ হয়ে। তাই শুধু লেখাপড়ায় প্রথম না হয়ে, জীবনক্ষেত্রে প্রথম হবার শিক্ষা, আমাদের লাভ করতে হবে। তাই যে পর্যন্ত সমাজে এই সংগীতের চর্চা না হয়, ততদিন এর সুফল পাওয়া যাবে না।

সেবকদের জন্য একটা শিক্ষার পদ্ধতি স্থির করতে হবে। সেবার উদ্দেশ্য লোককে "মানুষ" করে তোলা। যতদিন নিজেরা না মানুষ হচ্ছি, ততদিন কি করে লোককে মানুষ করব? এই-সব শেখার জন্য রীতিমত training নেওয়া দরকার, সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য Night School খোলা যেতে পারে। কিন্তু তা করতে হলে, কী শেখানো হবে— কিভাবে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, সেগুলি আবিষ্কার করা দরকার। সাধারণ স্কুল-পাঠশালার ব্যবস্থা এখানে চলবে না। এর জন্য special training দরকার, নচেৎ ভালো কর্মী তৈরি হতে পারে না। অথচ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও বিশেষ দরকার। দশজন ভালো কর্মী পেলে, একটা স্কুল বেশ চলতে পারে। আর এই-ই লোকশিক্ষার একটা মস্ত field, তবে এই-সব কাজ সার্থক করতে হলে, দেখতে হবে, দেশের যে অবস্থা নিত্য দেখছি, তাই দেশের প্রকৃত রূপ কি না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেশমাতৃকার যে তিনটি চিত্রের কথা আছে, সেই চিত্র তিনটি মানসপটে অঙ্কিত রাখতে হবে তবেই বর্তমান সময়ে কী করা উচিত— তা আমরা বুঝতে পারব। চিত্র তিনটি : দেশ কী ছিল— কী হয়েছে— আর কী হবে।

যে দেশ এককালে বড়ো ছিল, যে দেশে গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন,

যে দেশে এককালে মানুষ জন্মেছিল, সে দেশ আবার বড়ো হতে পারে।" স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনো।" দেশবন্ধুও বলতেন— "আত্মবোধ ভুলে যাওয়াতেই বাঙালী এইরূপ হয়ে পড়েছে।" এ খুব সত্য কথা। তাই মেকলে আমাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে জাতি হিসাবে আমরা অপমানিত হয়েছি বটে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। কেননা যাদের সংসর্গে তিনি এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি সত্যই তেমনি স্বার্থপর হীন লোক তখনো ছিল। মেকলে ভুলক্রমে তাদের কটিকেই বাংলার স্বরূপ, প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ আমরা আবার মানুষ হবার চেষ্টা করছি। আত্মবিশ্বাস আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। যাঁদের গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই, যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সকলেই জীবনের গোড়া থেকে এমনি আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাস হারিয়েই আজ আমরা অন্নবস্ত্রহীন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীন। দুর্দিনের এই অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের দেশে এত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। বাঙালী সভাজগতে সকলের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় সক্ষম। কী বিদ্যা, কী জ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য— সকল বিষয়েই আমাদের দেশের লোকেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করতে পারে। এই পরাধীন জাতির মধ্যেও এই ভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাতি এখনো বেঁচে আছে।

বিবেকানন্দ বলতেন— man making is my mission— খাঁটি মানুষ তৈরি করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ। কেননা ব্যক্তি হচ্ছে জাতির ভিত্তিস্বরূপ। আর এই ব্যক্তিত্ব ফুটবে কি করে— মানুষ তৈরি হবে কি করে? হবে, এই-সব সমিতির দ্বারা। বাংলাদেশের শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছু হবে না— যদি কিছু হয়, এই সমিতির দ্বারাই হবে।

সমিতির যারা সেবক, তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেবা ক'রে তারা অপরকে ধন্য করে না, তারা নিজেরাই ধন্য হয়। তারা সত্যকার শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে "মানুষ" হতে পারে। সেবা করে জীবনে এমন একটা প্রেরণা আনন্দ জাগে, এমন একটা ছাপ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, যা সারা জীবনের একটা সম্পদ হয়ে ওঠে। আমার ব্যক্তিগত ধারণাও এই। সমিতিই প্রকৃত মানুষ হবার কেন্দ্র। এই ভাবটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। পাঁচজনের উপকার করব,

এ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। সাহায্যপ্রার্থীর মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন না হলে জানতে হবে আমরা অপরের কিছুই করি নি, আমাদের নিজেদেরই উপকার করছি। সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? তা জানতে হলে একটু দূরদর্শী হতে হবে, পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পূর্বে বন্যার প্রসঙ্গে যা বলেছিলুম সেই কথাই আবার বলি, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। সেবা করতে গিয়ে, আমরা এ কাজে কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হয়েছিলুম। অনেকের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল, তাতে বোঝা গেল, এর প্রতিকার সম্ভবপর। দুর্ভিক্ষ বন্যার প্রতিরোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত নয়। সবই মানুষের হাতে। একটা কথা ভেবে দেখলেই হবে, অন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না আর আমাদের দেশেই বা হয় কেন ? এই ইংলন্ডে দু মাসের উপযোগী খাদ্য উৎপন্ন হয় আর আমাদের দেশে দু বৎসরের উপযোগী খাদ্য জন্মায়— এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশেই বা এরূপ দুর্ভিক্ষ হয় কেন ?

এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সংরক্ষণের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা দরকার। পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল, কাজেই দুর্ভিক্ষ এত অধিক হত না। আর আজকাল একটি জেলায় যদি কোনো বৎসর অজন্মা হয়, তবে সেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এর কারণ কি ? এ সমস্যার সমাধান করা দরকার কেননা এ-ই প্রকৃত অন্ন সমস্যা !

এক শত বৎসর পূর্বেও ঘরে ঘরে চরকা তাঁতের প্রচলন ছিল। বাংলাতে লক্ষাধিক তাঁতি জোলার বাস ছিল ; তারাই কোটি কোটি লোকের বস্ত্র সরবরাহ করত। যখন বিলাতী সস্তা কাপড়ের আমদানী হল— তখন সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে, একবার ভেবে দেখলুম না, এর পরিণাম কি হবে ! গ্রামে গ্রামে চরকা তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহারা হয়েছে, অনেকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে যখন অন্যসব জিনিস বিদেশ হতে আসতে লাগল, তখন বাংলাদেশের যাবতীয় শিল্প একে একে ধ্বংস হতে লাগল। আর জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হওয়ায় কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। চাষবাস আর শিল্প-বাণিজ্যই হচ্ছে দেশের উন্নতির সোপান, পরম সম্পদ। শিল্প বাণিজ্য হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে, 'কেবলমাত্র চাষের উপর নির্ভর করায়, আমরা আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছি। দারিদ্র্য এত অধিক যে, জমিতে চাষের জন্য সার ব্যবহার করে জমিকে উর্বরা করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

আর, এই একশত বৎসর ইংরেজদের অবস্থা কি ছিল দেখা যাক। তখন এদেশের কাপড় বিলাতে বিক্রীত হয়ে এদেশে অর্থেরই আমদানী করত। নিজের দেশের উৎপন্ন থেকে নিজেদের অভাব মিটে যেত ; যা উদ্বৃত্ত থাকত, তাই বিদেশে রপ্তানী করা হত। তাই সেই সময় ইউরোপ এ-দেশ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করত— India drinks wealth of the world but gives nothing in return— আজ ইউরোপ যা করছে ভারত একদিন তাই করত, তাই দুদিক দিয়ে আমাদের লাভের অংক ... ষ্টিলাভ করত— ফলে ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ভারতের এই ধন-ঐশ্বর্যের আকর্ষণেই ইংরেজ এদেশে এসেছিল। ঐশ্বর্যের কারণ ছিল, আমরা এ দেশের উদ্বৃত্ত রপ্তানী করতুম বটে, ওদেশ থেকে তার বিনিময়ে কিছুই আমদানী করতুম না। ইংরেজ তাই নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করবার আশায় নিয়ম করে শুল্ক বসিয়ে আমাদের দেশের কাপড় চালান দেওয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। তাতেও বিশেষ ফললাভ না হওয়ায়, তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করল যে, ভারতীয় বস্ত্র কেহ ব্যবহার করতে পারবে না, কোনো ব্যবসায়ী তা আমদানী করতে পারবে না— করলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তাতেও যখন আশানুরূপ ফললাভ হল না, তখন তারা সামাজিক প্রথার সাহায্য গ্রহণ করলে। এইভাবে তারা সে দেশে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে, দেশে বস্ত্রশিল্পের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশের ধ্বংসের সঙ্গে সংগে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় এভাবে শিল্পের অভ্যুদয় ঘটানো অসম্ভব। এমনভাবে আমরা শৃংখলিত যে, কোনো কাজ করতে সক্ষম নই। ইম্পিরিয়েল ব্যাংক আমাদের দেশের ব্যাংক হলেও, দেশের কোনো ব্যাবসাকে সে সাহায্য করবে না। এদেশের রেলের ব্যবস্থাও ভিন্ন। এক প্রদেশ থেকে আর প্রদেশে কোনো জিনিস চালান করতে রেলে যা খরচ পড়ে, ইংলন্ড কি আমেরিকা থেকে সে জিনিস ভারতে আনতে তার চেয়ে অল্প খরচ লাগে— এত বেশি এব ভাড়া। কাজ করবার কোনো সুযোগই আমাদের নেই। গভর্নমেন্ট স্টোর আছে, কিন্তু এদেশী জিনিসের এখানে কদর নেই ; এর উদ্দেশ্য নিজেদের ব্যাবসার শ্রীবৃদ্ধি করা! এমন-কি, জার্মানির অল্প মূল্যের জিনিস বাদ দিয়ে বেশি দামের ব্রিটিশ Goods এখানে কেনবার ব্যবস্থা হয়! Department of Industriesও এইরকম একটা ভুয়ো সংস্থা। ইংরেজ বণিক ব্যাবসা

করতে এসেছে, সুতরাং গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করা। বেঙ্গল কাউন্সিলেও ইংরেজ ব্যাবসাদার সদস্যরা গভর্নমেন্টের পক্ষে ভোট দেন এই কারণে ব্যবসায়ে সাহায্য লাভে আমাদের স্থান কোথাও নেই। অল্প মাইনের চাকুরি কয়েকটা খোলা আছে— তার কারণ এত অল্প বেতনে বিদেশ থেকে লোক আসে না। একটু ভালো চাকুরিতে এ দেশীয় লোকদের অধিকার নেই।

বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু চাষবাসে দেশ বড়ো হতে পারে না, অন্ন সমস্যা বেকার সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। কি কাজ আমরা করব ? এক চাকরি আর ব্যাবসা… কিন্তু সেও আমাদের করায়ত্ত নয়। এর জন্য কমিটি অনেক নিযুক্ত হয়েছে— কিন্তু আসল কথা, যতদিন-না ব্যাবসা-বাণিজ্য আমাদের হাতে আসছে, ততদিন কোনো আশা নেই। আমাদের সংকল্প করতে হবে— ব্যাবসা আমাদের হাতে নেওয়াই চাই ! যে-সব বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, তা মোচন করতেই হবে। আমাদের পথ খুঁজে নিতেই হবে, কেননা ব্যবসা ছেড়ে দিলে, শিক্ষার দিক দিয়েই বা আমরা কোথায় ? ইংরেজ আজ দেড়শো বৎসর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে শতকরা পাঁচজনকে শিক্ষা দিয়েছে— এতে তাদের এদেশে আর শাসন করবার দাবি কোথায় ? এইভাবে শিক্ষা পেতে হলে, সারা ভারতের শিক্ষিত হওয়ার পূর্বেই জাতি ধ্বংস হয়ে লোপ পেয়ে যাবে। শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেই গভর্নমেন্ট বলেন টাকার অভাব, অথচ তাঁদের কোনো কাজে টাকার কখনো অভাব ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে ছ' কোটি টাকা ব্যয়ে "বালী ব্রিজ" হতে পারে— পুলিসের জন্য অজস্র টাকা ব্যয়ও কিছুই নয়— কেননা পুলিস না হলে বর্তমান শাসন-পদ্ধতি চলবে না— ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ধর্মঘট প্রভৃতিতে বা কুলী-মজুরের হক দাবিতে বন্ধ হয়ে যাবে— কাজেই এ বিষয়ে ব্যয় করতে গভর্নমেন্ট মুক্তহস্ত। কেবল আমাদের দেশের কাজের বেলাতেই টাকার অভাব ঘটে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য — এই চারটি হচ্ছে আমাদের বড়ো সমস্যা— গভর্নমেন্টের সাহায্য না পেলে দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে কোনো কাজ না করলে এ-বিষয়ে কোনো সুফল হবে না। কিন্তু গভর্নমেন্টের সকল কাজের বেলায় উত্তর একই, টাকার অভাব। Primary Education Bill কার্যকরী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে তাতেও tax দিতে হবে। যদিও আমাদের দেশ দরিদ্র, করভারে ইতিমধ্যে প্রপীড়িত তত্রাচ টাকা চাইলেই সেই এক উত্তর—Tax দাও।

সকল সমস্যার মূলে ধন-সমৃদ্ধি করতে হবে। শস্যের রপ্তানী বন্ধ করে দেশে অন্নের সংস্থান রাখতে হবে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এ-বিষয়েও সেই উত্তর— টাকার অভাব! প্রকৃতপক্ষে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি আমাদের হাতে না এলে, কিছুই হবে না। গভর্নমেন্ট আমাদের ওপর কি রকম ধারণা পোষণ করেন, তা দিনাজপুরে গতবার দুর্ভিক্ষের সময় প্রকাশ পেয়েছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছিল— মা সন্তানকে বিক্রয় করেছে, স্বামী স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। শোচনীয় দুর্দশাতেও গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলেন না। শুধু তাই নয়, স্ত্রী ও সন্তানবিক্রয়ের অন্য কারণ নির্দেশ ক'রে ব্যাপারটি অতিরঞ্জিত ঘটনা বলে এক ইস্তাহার জারী করলেন। এ সময় সাহায্য করা দূরে থাক্, এই ব্যাপারে জাতিকে অপমান করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। স্বাধীন দেশ হলে এই ইস্তাহার দেওয়ার পর গভর্নমেন্ট একদিনও থাকত কি না সন্দেহ।

যাঁরা বেশ ভালোভাবে, ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখে থাকেন, তাঁরা দুঃখ-দারিদ্র্য বুঝতে পারেন না। শাসক যদি প্রজার বেদনা অনুভব না করে তবে এরকম ইস্তাহার হবেই। যদি তারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে বাস না করে তবে সেখানকার দুঃখ ব্যথা বুঝবে কি করে? তাই আমাদের সমস্ত Political Problem। ইংরেজ বলেন সামাজিক সংস্কার না হলে Political Problem ঘুচবে না। কিন্তু মুখে তা বললেও, কার্যত তাঁরা কোনো সংস্কারই পছন্দ করেন না, তাঁরা বেশ জানেন যে 'প্রাণ' যে জাতির একবার জেগে উঠেছে, সে জাতি সর্বতোভাবে জেগে উঠবে। তাঁরা কোনো অংশের মধ্যেই জীবনের স্পন্দন দেখতে চান না। তাঁরা জানেন, তাহলে এ শাসন এ শোষণ আর চলবে না। এই কারণেই বিশেষ দরকার 'সেবা'। কিন্তু এ-বিষয়ে অনেকদূরে লক্ষ্য রেখে, আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের এখন বড়ো সমস্যা হচ্ছে পরাধীনতা— জাতিকে এর নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। ক্ষমতা আমাদের কিছুই নেই। ক্ষমতা নিজেদের হাতে এলে বলতে পারি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে আমরা জাতি গড়ে তুলব। গত দশ বৎসরে আমাদের এশিয়ার কত সুপ্ত জাতিই জেগেছে, তার কারণ ক্ষমতা এসেছে তাদের হাতে।

এদেশেও আজ প্রাণের স্ফুরণ দেখা দিচ্ছে। জাতির জীবনীশক্তি আজ আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, রসায়ন, খেলাধুলো, ব্যায়াম— সব বিষয়েই নূতন সৃষ্টি দেখা দিচ্ছে, এই হচ্ছে জাতির জীবনের

লক্ষণ। আমাদের মধ্যে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তার যে লক্ষণ চারিদিকে ফুটে উঠেছে, এই আশার কথা। জাতীয় জীবনের আজ সর্বতোমুখী আত্ম-প্রকাশ দরকার।

এই-যে সমিতির মধ্যে এসে সকলে মিলিত হয়, এ সুখের বিষয়— কেননা এই প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র। বুঝতে হবে সেবা কি? মানুষ কি? দেশের বর্তমান অবস্থা, দেশের স্বরূপ কি? এই-সব বুঝতে প্রাণে অনুভূতি দরকার। মহৎ কাজের মূলে থাকে অনুভূতি। গৌতম বুদ্ধ, জরা দৈন্যের নিদর্শন দেখে দুঃখ পেয়ে, সেই দুঃখ দূর করবার সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। লোকের কষ্ট দেখে, সে কষ্ট দূর করবার জন্য যদি প্রাণে আগ্রহ না জাগে তবে প্রেরণা আসবে কোথা হতে? দুঃখের মূর্তি দেখলে প্রাণে বেদনা জন্মে। বেদনা না জাগলে সেবা করা যায় না। প্রত্যেক কর্মীকেই একটা-না-একটা বেদনা পেতে হয়েছে— তবেই জীবনে একটা transformation এসেছে।

লেখাপড়ার উদ্দেশ্য শুধু নিজের সুখবৃদ্ধি নয়। গতানুগতিকের পথ থেকে সকলকে ফেরাতে হলে প্রাণে বেদনা, অনুভূতি জাগাতে হবে। যদি আমরা ভাবি আমরা কী ছিলুম, আর যদি কল্পনায় ভেবে দেখি আমরা কী করতে পারি, যদি প্রাণকে জাগাতে পারি, বর্তমানে স্বাধীন জাতিরা কিভাবে আছে আর আমরা কী হতে পারি তবেই মানুষের প্রাণ জাগবে। মানুষের জীবনকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে তারা দেশসেবার জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারবে। এই হওয়া উচিত যুবকের আদর্শ, আর এতে আছে আনন্দ। ত্যাগে কোনো কষ্ট নেই, তাহলে মানুষ ত্যাগ করতে পারত না। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পারলে আনন্দ জাগে না। ত্যাগেনৈব আনন্দম্— এ কথায় মিথ্যা কিছুই নেই।

সমিতির মধ্যে যতদিন না মানুষ তৈরি হবে, ততদিন বুঝতে হবে সমিতির উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মানুষের শক্তি জাগাতে পারলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা যায়। বর্তমান যুগ কর্মের যুগ, আত্মবিসর্জনেই প্রকৃত আনন্দ, এই ভাব মনে জাগিয়ে রাখলে দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে নূতন জাতির সৃষ্টি হবে। বিরাটত্বে, [illegible], আমাদের দেশে অভাবের কিছুই নেই। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জাতীয় সম্পদ কোথায় আছে? কবি, দার্শনিক, বণিক, শক্তিশালী বলবান লোক প্রত্যেকেরই এক 'বৈশিষ্ট্য' আছে। প্রকৃতপক্ষে

উপাদানের অভাব আমাদের কিছুই নেই। আমাদের এখন দরকার এই বিচিত্র উপাদানগুলি একত্র আহরণ করে সংঘবদ্ধ করে এক অপূর্ব মূর্তি গঠন করা। তারপব সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেটা সম্ভবপর হবে যদি আমাদের প্রাণ জাগে। যদি আমরা বেদনা পেয়ে প্রাণকে জাগাতে পারি, তবেই অসীম শক্তির উদ্বোধন হবে। এই শক্তির প্রথম উদ্বোধন হবে ব্যক্তিত্ব— তারপর ব্যক্তি থেকে সমগ্র জাতির মধ্যে এ শক্তি অনুপ্রাণিত হবে।

আজ আশা করি, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা চলবেন। আপনাদের সমিতিতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে।

মার্চ ১৯২৯

জননী জাগৃহি

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে অসীম স্নেহ ও অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার অন্তরের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সেবকমাত্রই আপনাদের স্নেহের পাত্র এবং আমি গত কয়েকবৎসর যাবৎ দেশ-মাতৃকার সেবার ভিতর দিয়া নিজের জীবন সার্থক ও সফল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। বিদেশী আমলা-তন্ত্র মাতৃসেবার প্রচেষ্টাকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে এবং তারই জন্য আমলাতন্ত্রের নিকট মাতৃ-সেবককে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করিতে হয়। কিন্তু লাঞ্ছিত সেবকের ম্লান ললাটে আপনারা সম্মান ও প্রীতির রক্তচন্দন টিকা পরাইয়া থাকেন এবং ভাব-প্রবণ বাঙালী জাতির স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত তাহার উপর স্নেহ ও শুভ-ইচ্ছা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তথাপি এ কথা আমি আজ বলিতে বাধ্য যে ব্যক্তিগত যোগ্যতার গুণে আমি আজ এ-আসন গ্রহণ করি নাই। আমাকে সভাপতিত্ব প্রদান করিয়া আপনারা সম্মান ও আস্থা দেখাইয়াছেন বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির প্রতি; এই অনুষ্ঠানে আমি আজ নিমিত্তমাত্র। আমি এখনো যৌবনের সীমানা অতিক্রম করি নাই এবং অগণিত মুক্তিপথযাত্রীর মধ্যে আমিও একজন পথিক। তাই বলি, হে আমার বাংলা মায়ের সন্তানবৃন্দ আশীর্বাদ করুন যেন আজিকার এই প্রীতি ও সম্মানের কথঞ্চিৎ যোগ্য হইতে পারি; যৌবনের প্রারম্ভে যে পথ আশ্রয় করিয়াছি, সারাটি জীবন যেন ক্লৈব্য, শ্রান্তি ও মোহের হাত এড়াইয়া সেই পথেই বীর-পদবিক্ষেপে চলিতে পারি।

যে স্থানে আজ আপনারা সমবেত হইয়াছেন কত ইতিহাস তাহার আছে। কত রাগোজ্জ্বল প্রভাত ও কত ঘোর অমানিশার কাহিনী তাহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে, কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি বাঙালীর মানসপট হইতে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়া জাতির নবজাগরণ আসিতে পারে না।

তাই আসুন, স্মৃতিবহুল এই পুরাতন ও পবিত্র বরেন্দ্রভূমে আমরা একবার কালের অবগুণ্ঠন সরাইয়া রংপুরের অতীত গৌরবের পর্যালোচনা করি।

প্রাচীন কিম্বদন্তী এই অঞ্চলের সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের লীলা-বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। এই শিবধামে মুক্তিকামী বাঙালীকে আপনারা আজ আহ্বান করিয়াছেন। কালের চক্রান্তে অমৃতের পুত্রগণ শিবত্ব হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; 'তাই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' এই অতীতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা শব-সাধনার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি।

মহাভারতের যুগে রংপুর কামরূপ বা প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভগদত্ত ছিলেন রংপুরের অন্যতম রাজা এবং তিনিই নাকি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পর 'রঙ্গপুর' নামকরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে বিখ্যাত পালবংশীয় অধিপতিগণ রংপুর অঞ্চলে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া মানিকচন্দ্র তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করেন। মানিকচন্দ্রের গান আজও নানাস্থানে গীত হইয়া থাকে। এই-সব গানের ভিতর দিয়া উত্তরবঙ্গের অধিবাসিগণ মানিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা, তাঁহার পুত্র গোপীচন্দ্রের ও তদীয় পত্নীদ্বয় অদুনা-পদুনার হৃদয়গ্রাহী কাহিনী শুনিয়া থাকেন। তারপর উত্তরবঙ্গে যখন প্রবল পরাক্রান্ত নীলধ্বজ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন তখন রংপুর তাঁহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল! মুসলমান যুগে হুসেন শাহের মতো বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ নৃপতি এই অঞ্চলে শাসন করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগের অবসানে ও ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভে যখন অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল তখন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতির নেতৃত্বে শত শত সন্ন্যাসী এবং সহস্র সহস্র নির্ভীক ও স্বদেশানুরাগী বঙ্গবাসী স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এই-সব অলৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বর্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' —প্রণয়নের দ্বারা নবজাগরণের বোধন করিয়াছেন। জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত— কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে এই রংপুর জেলা চিন্তার ও সৃষ্টির কত উপকরণ যোগাইয়াছে! কে বলিতে পারে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্ন সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় লেখনী সঞ্চালনের দ্বারা তিনি যাহা সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন— সেই স্বপ্ন তিনি রংপুরে দেখেন নাই?

রংপুরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলেই মনে পড়ে বরেন্দ্রভূমের কথা, গৌড়ের স্বপ্নময়ী স্মৃতি, পাল সাম্রাজ্যের কাহিনী ; সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে বরেন্দ্রভূমে বাংলার রাজগণের অপূর্ব শৌর্য বীর্য দেখা গিয়াছিল কী শিল্প, কী সাহিত্য, কী পাণ্ডিত্য— সকল বিষয়ে একদিন যে দেশে বাঙালী প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়াছিল— আজিকার এই রংপুর সেই বরেন্দ্রভূমেরই অন্যতম অংশ— বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের গৌরবময় লীলাস্থল।

এই বরেন্দ্রভূমে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে বিপুল সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে জয়ী হইয়া প্রজাবর্গই নিজ মনোনীত ব্যক্তি গোপালদেবকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল এবং দেশ হইতে 'মাৎস্য-ন্যায়' বা অরাজকতা বিদূরিত করিয়াছিল। তারপর পালবংশের অন্যতম রাজা মহীপালের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং মহীপাল সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। প্রজামণ্ডলী কৈবর্তজাতীয় একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার নাম দিব্বোক। কৈবর্তজাতীয় রাজগণ কিছুকাল শাসন করার পর পালবংশীয়েরা আবার বাহুবলে রাজ্য ফিরিয়া পান। পালবংশীয় রাজা দেবপালের আমলে বাঙালী হিমাদ্রি হইতে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্বসাগর হইতে পশ্চিমসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। "এই দেবপাল উৎকল-কুল উৎকলিত করিয়াছিলেন, হূণ-গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, দ্রাবিড় গুর্জর-নাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন।" (গরুড় স্তম্ভলিপি, ১৩শ শ্লোক)। এই সাম্রাজ্যের রণতরী ভারতের বিভিন্ন নদ-নদীতে গমনাগমন করিত— সুদূর সিংহল সুমাত্রা যবদ্বীপে পর্যন্ত বাংলার পণ্যবাহী-অর্ণবপোত চলিত। কথিত আছে যে বাঙালীর এই দিগ্বিজয় বার্তা শ্রবণমাত্র— "উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিতেন — আর প্রাগ্জ্যোতিষের অধীশ্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সন্ধি-বন্ধন করিতেন। বাঙালীর বিজয়গৌরবে দাক্ষিণাত্যের শিল্পবুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল, লাট দেশের কমণীয় কান্তি আবিল হইয়াছিল, অঙ্গদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল ; কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্যদেশের রাজ্যসীমা সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল।"

এই হইল প্রায় সহস্রবৎসর পূর্বের কথা। এ কীটদষ্ট জীর্ণ ইতিহাস

আজিকার বাঙালীর নিকট হয়তো নিশাশেষের সুখ-স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বাঙালীর এই জাতীয় সভায় দাঁড়াইয়া বাঙালীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমি তাই একবার আলোচনা করিতে চাই— বাংলার ইতিহাসের ধারা, বাংলার স্বরূপ, বাংলার আদর্শ ও সাধনা। বাংলাকে যে চেনে না— বাঙালীর সুখ-দুঃখের কাহিনী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ যে রাখে না, সে বাঙালীকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে কি পরামর্শ দিতে পারি ?

সমগ্র বাংলা জেলা-মহকুমা প্রভৃতি ভাগ-বিভাগ সত্ত্বেও এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ দেশ। শীর্ষে ধবলতুষার-কিরীট হিমাদ্রি ; চরণদেশে কলহাস্যময় চিরচঞ্চল বারিধি ; বক্ষে গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কলুষহর-তরঙ্গা নদ-নদীর বিচিত্র শোভা! এই বৈচিত্র্যের সমাবেশের ফলে আজ আমাদের বঙ্গজননী এক অখণ্ড নিখুঁত রূপের মধ্যে আমাদের নিকট প্রকট হইয়াছেন।

বিভিন্ন জেলায় সামান্য সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলার ইতিহাস, বাংলার সমাজ, বাংলার ধর্ম— এক অখণ্ড সত্য। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একদিন বলিয়াছিলেন – 'বাংলার মাটির মধ্যে এক চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্তন আবর্তন ও নিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে বিপ্লবে, ধর্মে কর্মে, অজ্ঞানে অধর্মে স্বাধীনতায় পরাধীনতায় সেই সত্য আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনো করিতেছে। সে যে বাংলার প্রাণ— বাংলার মাটি, বাংলার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ।'

বাঙালীর সভ্যতা একদিনে ফুটিয়া উঠে নাই। ফুল কখনো একদিনে ফোটে না। তাহার বিকাশের জন্য অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঙালী আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। শতদলরূপী যে বাঙালী সভ্যতা, তার প্রত্যেক দলের মধ্যে আছে অনেক গান, অনেক কথা, সুখদুঃখের অনেক করুণ কাহিনী। তাহার গন্ধে আছে অনেক কালের অনেক মধুময় স্মৃতি, তাহার প্রতি বৃন্তে আছে বহু শতাব্দীর অনুভূতি চিহ্ন।

বাংলার একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। বিশ্বদরবারে শুনাইবার বাঙালীর

একটি চিরন্তন বাণী আছে। সমগ্র বাঙালী-জাতির যে অখণ্ড ইতিহাস তাহা সেই শাশ্বত বাণীকে প্রকট করিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা ভুলিয়া যাইতে পারি কিন্তু বাংলার ইতিহাস ও বাংলার প্রাণ-ধর্ম কখনো আমাদের ভুলিবে না। বাংলার প্রাণ চায় সর্বদা— বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সাম্য। বাঙালী সব কাজের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব ভালোবাসে। সে স্বভাবত গতিশীল ও পরিবর্তনাভিলাষী— 'বিপ্লবী' বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে এমন-কি বৈদিক যুগ হইতে, আজ পর্যন্ত এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলকে 'কিরাত' দেশ বলা হইত। এই প্রদেশ আর্য সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরেই ছিল এবং এই দেশে কোনো আর্য আসিলে সে পতিত হইত। এই অঞ্চলের অধিপতিবৃন্দের সহিত আর্যদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিত। 'দস্যু', 'অনার্য' প্রভৃতি আখ্যা আর্যদের নিকট পাইলেও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে অত্যন্ত সুসভ্য ছিল তাহা বেদ ও মহাভারত পাঠ করিলে বুঝা যায়। বৃহত্তর মগধে (বা পূর্বাঞ্চলে) আর্য সভ্যতা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিলে স্মৃতির বিধান পরিবর্তন হইল এবং তখন পূর্বাঞ্চলে আসিলে আর্যেরা পতিত হইত না। কিরাত দেশে গমনাগমনের বাধা উঠিয়া যাওয়ার পর এই প্রদেশের লোকেরা ক্রমশ আর্যসমাজে স্থান পাইল।

আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে লাভ করিয়া যে শিক্ষা (or culture) পূর্বাঞ্চলে গড়িয়া উঠিল—আমরা তাহার নাম দিতে পারি 'মাগধী শিক্ষা' (Magadhi Culture)। এই শিক্ষার কেন্দ্র প্রথমে ছিল মগধ দেশে কিন্তু পরবর্তী যুগে মগধ দেশ উত্তরাপথের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গেলে বঙ্গদেশ মাগধী শিক্ষার উত্তরাধিকারী হইল এবং মাগধী শিক্ষার নূতন কেন্দ্র বাংলায় উদ্ভূত হইল। কিছুকাল বৈদিক সভ্যতার প্রভাবে বাস করিয়া পূর্বাঞ্চলবাসীরা বৈদিক ধর্মকাণ্ড ও বর্ণাশ্রম ধর্ম আর সহ্য করিতে পারিল না। দুইটি বিপ্লবের ধারা তখন এই প্রদেশ হইতে প্রবাহিত হইল— জৈনধর্ম ও জৈন মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধমতবাদ। এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া বৃহত্তর মগধ চেষ্টা করিল সমাজের উচ্চ প্রাচীর ধ্বংস করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বেদের পারলৌকিকতা ও কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে ইহ-জীবনে

নিষ্কাম কর্ম ও সেবার দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানবত্ব লাভ করিতে। বহু শতাব্দী পরে বৈষ্ণব কবির অনিন্দনীয় ভাষায়ও এই মানবতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল—

'শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এই মানবতা ও সাম্যবাদের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রকট হইল। বৌদ্ধযুগে বৃহত্তর মগধে গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এই যুগের ইতিহাস হইতে প্রায় ৮০টি গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের নাম উদ্ধার করেন। যে জৈনধর্ম আজ মাত্র ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আশ্রয় পাইয়াছে— বাঙালী আজ যে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই জৈনধর্মের মহাপুরুষ তীর্থংকরগণ যে অধিকাংশই আমাদের অর্থাৎ অনার্য মগধ-বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সংবাদ কি আমরা আজকাল রাখি? জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর দিয়া বেদ ও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে প্রদেশে প্রথম দেখা দিয়াছিল সেখানকার জল ও মাটি যদি বিপ্লবের অনুকূল হয় তবে সে অপরাধ কাহার?

নূতন ধর্ম ও নূতন আদর্শের প্রেরণায় পূর্বাঞ্চলবাসীরা দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। ইহাই বোধ হয় ভারতের প্রথম অভিযান— যদিও এই অভিযানের অস্ত্র ছিল তরবারি নয়— জ্ঞানের প্রদীপ। জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া এই প্রদেশের লোকেরা মেঘস্পর্শী পর্বতরাজি ও উত্তাল তরঙ্গসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। নূতন সত্য, নূতন উদ্দীপনা লাভের ফলে ভারতীয় সভ্যতা সব দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিল; কাব্য-শিল্প, দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্ম ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছুরই অভাব রহিল না। যে সম্পদ সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসী ধন্য হইল, তাহা লাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। ভারতের ইতিহাসে সে এক অতুলনীয় গৌরবময় যুগ।

এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু, অদ্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র এবং জগদ্বিখ্যাত দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত কত শিল্পী, কত সাধক যে জন্মিয়াছিলেন কে তাহার হিসাব রাখে?

বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে খর্ব করিয়া ক্ষত্রিয়শক্তি যেরূপ প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়াছিল— বৌদ্ধযুগের পর আবার সেই ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হইল। মৌর্যবংশীয় রাজগণ যেরূপ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণ তদ্রূপ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সহায়তা করিলেন। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় জাতির যে সম্প্রসারণ (Expansion) ঘটিয়াছিল তাহা কতকটা বাধা পাইলেও বন্ধ হইল না। সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে তাঁহার রাজ্য বিপুল ঐশ্বর্য, শক্তি ও বৈভব লাভ করিল। দেশের বাহিরে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা প্রচারিত হইতে লাগিল।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পর্যন্ত মগধ ও বাংলাদেশ শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে কর্মে একসূত্রে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু গুপ্তেরা হীনবল হইয়া পড়িলে দেশে অরাজকতা বা 'মাৎস্য-ন্যায়' সৃষ্টি হইল। এই অরাজকতা-যুগের শেষে মগধ ও বাংলা (বা গৌড়-বঙ্গ) বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বাংলা দেশে সুপ্তোত্থিত প্রজাশক্তি গোপালদেবকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল এবং পাল বংশের অধীনে বাঙালী আবার বৌদ্ধ হইল। এই সময় হইতে একদিকে মগধ দেশ শিক্ষায় দীক্ষায় উত্তরা-পথের সহিত মিশিয়া গেল এবং অপর দিকে বাংলাদেশ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্যের পথে চলিতে লাগিল। মাগধী শিক্ষার (Magadhi Culture) কেন্দ্রগুলি মগধদেশ হইতে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হইল। তারপর বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা; শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব, বিখ্যাত ভাস্কর ধীমান ও বীতপালের জন্ম। পালবংশের অধীনে বাঙালী শিক্ষায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ের অভিযানে বাহির হয়। যুক্ত মগধবাংলা মৌর্যবংশের অধীনে যেরূপ সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়াছিল স্বতন্ত্র বাংলা তদ্রূপ পালবংশের অধীনে সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয় আরম্ভ করে। বাঙালীর সাম্রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়—

"সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্মপালদেব 'মনোহর ভ্রূভঙ্গ বিলাসে' ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন অবন্তি গান্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদিগকে পরাজিত করিয়া[১] কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন।

১ খালিমপুর শাসক, ১২শ শ্লোক। ভাগলপুর শাসক, ৩য় শ্লোক।

রাজসিংহাসন তখন সমগ্র উত্তরাপথের অধিপতি ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। তাঁহার রাজ্য গান্ধার হইতে মিথিলার প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

আমি ঐতিহাসিক নহি, তবুও আমার বিশ্বাস যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতার অবসানে পালবংশীয় রাজা গোপালদেবের প্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র বাংলার (বা গৌড়-বঙ্গের) জন্ম। সহস্রাধিক বৎসর বাংলা নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পথে চলিয়া আসিতেছে।

চিরকাল একভাবে যায় না, তাই পাল-বংশ শক্তিহীন হইয়া পড়িলে সেন-বংশের রাজগণ গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। সেন-বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হয় এবং সেন-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম সৃষ্টি হয়। সেনবংশীয়েরা গৌড়-বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আমলে সামাজিক কলহ-বিবাদের দরুন রাষ্ট্রশক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর পাঠান-রাজ বক্তিয়ার খিলজি মগধ বিজয় করিয়া গৌড়-বঙ্গের পশ্চিমাংশ অধিকার করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাসাদ-তোরণে যখন ইসলামের অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতে-ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাসাদশীর্ষ হইতে তখনো স্বাধীনতা-সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু নিভিয়া যায় নাই। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পরে অন্যত্র বাংলা (বা গৌড়-বঙ্গ) মুসলমান শাসনের অধীনে আসে।

মুসলমান শাসনের সময়ে সাম্যবাদী বৌদ্ধসমাজ দো-টানার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিকাংশ বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুদয় পছন্দ না করিয়া এবং ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট বৌদ্ধ হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিল। বাহ্যত বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস হইলেও বৌদ্ধধর্মের সাম্যবাদের লোপ হইল না। হিন্দুসমাজের ধমনীতে এই আদর্শ ক্রিয়া করিতে লাগিল। ইহারই ফলে স্মার্ত রঘুনন্দন নূতন হিন্দুসমাজ গঠন করিবার জন্য নূতন স্মৃতি প্রণয়ন করিলেন— তখন তিনি রাখিলেন মাত্র দুইটি বর্ণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। উদার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে রঘুনন্দনের স্মৃতি সাম্যের দিকে বাংলার হিন্দু সমাজকে অনেক দূর লইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দনের আরব্ধ কার্য সমাধা করিবার জন্য, অর্থাৎ সাম্যবাদের ভিত্তির উপর হিন্দু সমাজকে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবির্ভাব। সাম্যস্থাপনের প্রচেষ্টা এখনো সফল হয় নাই। ইহা সফল করিতে তিন দিক দিয়া কাজ করা সম্ভব—

১. জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দেওয়া। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলন মোটের উপর এই চেষ্টাই করিয়াছে।

২. সব বর্ণকে শূদ্রে পরিণত করা।

৩. সব বর্ণকে ব্রাহ্মণ করা।

প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়া বাঙালী হিন্দুসমাজ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এখন সেই দিক দিয়া আরো চেষ্টা করা উচিত — না অবশিষ্ট দুইটি উপায়ের মধ্যে কোনো উপায় অবলম্বন করা বাঙালীর কর্তব্য, তাহা বাঙালী হিন্দুর পক্ষে এখন চিন্তার বিষয়।

যে জাতির মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণ বেশি পরিমাণে ঘটিয়াছে— সেই বাঙালী জাতিকে আজ রক্ত-সংমিশ্রণের ভয় করিলে চলিবে না। আজ আর অস্বীকার করা যায় না যে বাংলাদেশে মঙ্গোল, দ্রাবিড় ও আর্য রক্তের সংমিশ্রণ খুব ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছে। বাঙালী চরিত্রে যে বৈচিত্র্য ও সার্বভৌমিকতা আমরা পাই তাহার অন্যতম কারণ যে এই রক্ত-সংমিশ্রণ নয়— এ কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে?

দ্বাদশ শতাব্দীর পর যখন বাংলার রাজদণ্ড মুসলমানের হাতে, সে সময়েও বাঙালীর প্রাণধারা সজীব ছিল এবং জীবনের নব নব দিকে নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বাঙালী চায় সর্বদা— বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সাম্য। সাম্য স্থাপনের জন্য ফল্গু নদীর ধারার মতো একটা প্রচেষ্টা যেমন আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে— তদ্রূপ বাঙালী যখনই শক্তি সামর্থ্য পাইয়াছে তখনই সব দিক দিয়া নিজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। একঘেয়ে জীবন বা একঘেয়ে নীতি সে কখনো পছন্দ করিতে পারে না। কিন্তু বৈচিত্র্য যেখানে সে সৃষ্টি করিয়াছে সেখানে সে একতার দৃষ্টি ও সমন্বয়ের ক্ষমতা হারায় নাই। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়টি বিচিত্র চিন্তার, সাধনার ও শিক্ষার ধারা বাংলাদেশে প্রসূত হইয়া বাঙালীর প্রাণধর্মের অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছে তাহার সমন্বয়ও বাঙালী সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারিয়াছে। বাংলার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাই— রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায়ে, গৌরাঙ্গের দ্বৈতাদ্বৈতবাদে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে, রঘুনন্দনের স্মৃতিতে এবং জীমূতবাহনের দায়ভাগে। ন্যায়শাস্ত্রে, আইনশাস্ত্রে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ও সাধনায় এবং স্মৃতিতে বাঙালী নূতন ধারা প্রবর্তিত করিয়াছে।

আর তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারা তো জানেনই যে ইহা "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা"। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীকে Golden age of Bengali Culture বলিলে অন্যায় করা হইবে না। চিন্তা ও সাধনার রাজ্যে বাঙালী যাহা আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিচয়, আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে পাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, কাশীরাম কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতিষ্ক চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য গগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনকল্পে মুসলমানগণও যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহার সামান্য উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এদেশের প্রতি তাহাদের ভালোবাসা ও মমতা-বোধ কিরূপ প্রবল ও আন্তরিক ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত সম্রাট হুসেন শাহ গৌড় দেশ শাসন করিতেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহবর্ধক ছিলেন; তাঁহার রাজসভায় হিন্দু মুসলমান একত্রে শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, তিনি মহাপ্রভুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। 'পরাগলি মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্বে পত্রে পত্রে হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')

পদাবলী সাহিত্য বাংলার অমূল্য সম্পদ। কিন্তু মাত্র হিন্দু বা বৈষ্ণব কবিগণের রচনা দ্বারাই যে এ সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য রচয়িতা ব্যতীত আকবর ও আকবর শাহ আলি, কবীর, কমরালি, নসীর মামুদ, ফকির হবিব, কতন, সাল-বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিখ, শেখলাল, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের দান কিছুমাত্র তুচ্ছ নহে।

এইরূপে সাহিত্য-প্রচার ও অনুরূপ সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল— এ কথা যে কত সত্য তাহা সমসাময়িক সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু কবি গল্প বর্ণনাকালে মুসলমান সমাজের নানা পরিচয় দিয়াছেন, মুসলমান কবিগণও তাঁহাদের কাজে রামায়ণ বা মহাভারত-সম্পর্কীয় বহু উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। "ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে

দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সংগে একখানি কোরানও রাখা হইয়াছিল. রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের স্তবক শিখাইয়া গিয়াছেন।...মীরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপ মোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নি দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমন্দিরে ভোগ দিতেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৪৬৩); "হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী ও সখ্যতা সম্বন্ধে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে কবি আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীতে তাহার কিছু বাদ দেন নাই।" (ঐ পৃ. ৪৬৮)

এই সেদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেও মুন্সী হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুই সমসাময়িক কবি যেভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাহা এ যুগের অনেকেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ। বস্তুত বাংলার আধুনিক ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য— ইহার উন্নতিসাধনকল্পে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে কী পরিমাণ সাহায্য করিয়াছেন তাহা নির্ধারণ করা সহজ নয়— এক কথায় বলা যায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর চেষ্টায়ই আজিকার সমাজ ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় অবসাদ ও নবজাগরণ

অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বাঙালী যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন মহম্মদ বক্তিয়ার বাংলার দ্বার-দেশে আঘাত করেন। বাহিরের সংঘাতে তন্দ্রাবিজড়িত নেত্র উন্মীলিত হইল, বাঙালী আবার সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিরাম সাধনার পর ক্লান্তির ছায়া বাংলাকে আচ্ছন্ন করিল। ঠিক এই সময়ে ইংরেজের তূর্য নিনাদ বাংলার প্রান্তরে শুনা যায়। পাশ্চাত্য শক্তির সংঘাতে বাঙালীর শ্রান্তি ক্লান্তি আজ দূর হইয়াছে, সে আজ আত্ম-বিস্মৃতি ঘুচাইয়া নব নব সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত।

ক্লান্তি, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্রাম আত্মকলহ দূর করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন নূতন আন্দোলন প্রবর্তিত করেন। গৃহবিবাদ

ও মতভেদ ঘুচাইবার জন্য তিনি উদার বেদান্ত তত্ত্ব প্রচার করেন। যে-সমস্ত আবর্জনা বহু শতাব্দী হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা দূরে করিবার জন্য সংস্কার আরম্ভ হইল এবং ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্ট হইল। এই আন্দোলনের ফলে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করিল।

রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে পাই তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলৌকিক সাধনার বলে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির (যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান) মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈব ইত্যাদি) সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন খ্রীস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন করিয়া গেলেন। পরমহংসের অনুভূতি ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তারপর সমগ্র বঙ্গবাসী। এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া— কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সৃষ্টি ও নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে— এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালীজাতি সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের দান যে কোনো যুগে শ্লাঘ্য ও গৌরবময় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরমহংসের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী বিবেকানন্দ হাতে লইলেন। ভারতের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিবার জন্য তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ পরিব্রাজকের মতো জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া সাগরপারে চলিলেন। এতদিন পরে ভারতবাসী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের জন্য পাগল হইল ; বিশ্বদরবারে দিবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খুঁজিয়া পাইল, তারপর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানুজম্, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ কতদিক দিয়া বিশ্বসভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এই-সব মহাপুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ সমগ্র ভারতীয় জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের একটা আদর্শ আছে। বাঁচিবার একটা উদ্দেশ্য আছে— পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একটা mission আছে।

নিজের দেশের নবীন জাতি সৃষ্টির কাজও বিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। খাঁটি মানুষ তৈয়ারি না হইলে স্বাধীন ও বলবান জাতি জন্মিতে পারে না। তাই তিনি বলিলেন 'Man making is my mission'— খাঁটি মানুষ প্রস্তুত করাই আমার জীবনের কর্তব্য। তারপর খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি শ্রেণী বিশেষের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বাণী অমর হইয়া এখনো বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে :—

"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে ; জেলে মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।... এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।... অতীতের কংকালচয়— এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত !"

এই তো বাংলার Socialism। এই Socialism-এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই Socialism-এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হইতে।

যে গণ-আন্দোলনের সূচনা বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে পাই তাহা আরো পরিস্ফুট হইয়াছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ও সাধনার মধ্যে।

দেশবন্ধু বলিয়াছেন : মনে করিয়ো না শুধু তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে নারায়ণের বিরাজ। সে অহংকার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে— যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে— যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে সরল প্রাণে, মর্মে মর্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে— যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মতো জ্বালাইয়া, জাগাইয়া রাখিয়াছে— যাহারা বাস্তবিকই এদেশের একাধারে রক্তমাংস ও প্রাণ— 'উঠ, জাগ জাগ'— তাঁহাদেরই মধ্যে 'নর-নারায়ণ' জাগ্রত হউক।

জাতি-গঠন-কার্যে প্রথম সোপান খাঁটি মানুষ সৃষ্টি, দ্বিতীয় সোপান সংঘ-স্থাপন। বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন মানুষ তৈরি করতে। দেশবন্ধু চেষ্টা করিলেন রাষ্ট্রীয় সংঘ (Political Organisation) গঠন করিতে। এমন সংঘ তিনি গঠন করিলেন যাহা ইংরেজরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল তাহারা ইতিপূর্বে কখনো দেখে নাই। দেশবন্ধু আজ নাই —তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উত্তরাধিকারী ভাগ্যহীন আমরাই।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশ হইতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র -বিষয়ক আধুনিক চিন্তার ধারা এদেশে আসিতেছে। ইহার ফলে অনেকের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু যাহা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে অতি পুরাতন। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র এদেশে নূতন তত্ত্ব নয়। আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং এখনো ভারতের কোন্ নিভৃত প্রান্তে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র আছে তাহা জানি না বলিযা অতি পুরাতনকে নূতন অতিথি জ্ঞান করিয়া আদরের সঙ্গে আহ্বান করিতেছি।

সমাজ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় কোনো মতবাদকে অভ্রান্ত ও অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করা সমীচীন নয়। অধিকাংশ ism বা মতবাদের ভিতর অল্পাধিক সত্য আছে। তাই Socialism (গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র)-এ সত্য যাহা আছে আমরা তাহা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া Fascism-এর শৃঙ্খলা, সংঘবদ্ধতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা একেবারে বর্জনীয় নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য যাঁহারা— সেই রুশ জাতি— কার্ল মার্কসের বাণী অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই। তা যদি করিত তাহা হইলে এত শীঘ্র রাশিয়াতে Bolshevism-এর প্রতিষ্ঠা হইত না। বস্তুত Socialism-এর মূলতত্ত্বগুলি দেশকালোপযোগী করিবার পর রুশ জাতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমান সময়ে Socialism-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করার পথে আরো বেশি বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে রুশ জাতি New Economic Policy নামে নূতন অর্থনীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নূতন নীতি অনুসারে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি (Private Property) থাকিতে পারে এবং ব্যবসায়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কারখানার মালিক হইতে পারে। Socialist-এর পক্ষে new economic policy (বা নূতন অর্থনীতি) গ্রহণ করা

আত্মহত্যা করার তুল্য। কিন্তু রুশ জাতি নিতান্ত বাধ্য হইয়া তখন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে জাতির ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা অবহেলা করিয়া কোনো মতবাদ বলপূর্বক কোনো দেশে প্রয়োগ করা যায় না। এরূপ চেষ্টা করিলে হয় সেদেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে নতুবা Fascism-এর মতো কোনো বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে।

আর-একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হইলে, খাঁটি মানুষ তৈরি না হইলে, কোনো ism বা মতবাদের দ্বারা কোনো জাতির উদ্ধার হইতে পারে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত জাতির শিক্ষাদীক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সুখের বিষয় এই যে বলশেভিক রাশিয়ার মনীষীগণ আজকাল এই কথা হৃদয়ংগম করিতেছেন। ট্রটস্কি (Trotsky) তাঁহার *Problems of Life* নামক পুস্তকে এ-সব কথা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া মিনস্কি (Minsky) বলিতেছেন :—

"Life itself, the life of the masses and of the individual must be transformed, Trotsky says ; new Principles of life are needed, a new type of citizen must be helped to evolve, a new type of family is about to come into existence in Russia and ought to be helped to do so...

Two admissions acquire a special importance, coming from Trotsky. In the first place he rejects most emphatically ... the superstitious idea of a distinctly proletarian class culture. The masses in Trotsky's new and wiser view, need communion with the universal culture of the ages and ought to be educated accordingly It should be the task of the Russian intellectuals to help them

Trotsky's second admission is no less important He says now that the development of Personality is an absolute necessity for the evolution of a new type of family, Communism and Individualism, he declares in his book, far from being antagonistic, are but different social forces mutually attracting and completing each other.

বলশেভিক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত

হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর অতি-নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়িয়া তুলিব আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে এবং আবশ্যকমত বিদেশ হইতে জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিব— ইহাই ভারতবাসী মাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দীতে যে মুক্তিসংগ্রাম দেশের মধ্যে চলিতেছে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হইয়া আমরা এখন তৃতীয় অধ্যায় পৌঁছিয়াছি। প্রথম অধ্যায় স্বদেশী যুগ; দ্বিতীয় অধ্যায় বিপ্লবের যুগ, তৃতীয় অধ্যায় অসহযোগ ও গণ আন্দোলনের যুগ। অনেকে মনে করিতে পারেন যে আমাদের মুক্ত হইবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় নাই। যে জাতীয় আন্দোলন গত ২৫ বৎসর বা ৩০ বৎসর ধরিয়া প্রবলভাবে চলিয়াছে তাহার ফলে আমরা ক্রমশ হৃতশক্তি আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-সম্মানের জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছি; মেরুদণ্ডহীন জাতি চরিত্রবল অর্জন করিতেছে; শারীরিক বল ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন দেশের মধ্যে বাড়িতেছে এবং দেশবাসী ক্রমশ সংঘবদ্ধ হইতেছে, এ জাত একদিন মুক্ত হইবেই হইবে; ইহা বিধাতৃ-নির্দিষ্ট সত্য। পার্থিব শক্তির সাধ্য নাই যে চিরকাল আমাদের জন্মগত অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। আমাদের একমাত্র সমস্যা কত শীঘ্র আমরা স্বাধীন হইতে পারিব।

আমার দেশের লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অবিচলিত। বঙ্গভূমি কেবল বীরপ্রসবিনী নহেন। ইহার বৃহত্তর গৌরব— ত্যাগে। বাংলার বিজয় কাহিনী যেমন গঙ্গা-যমুনার মিলনক্ষেত্র পুণ্য প্রয়াগে জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, 'পুণ্যভূমি বারাণসী' অধিকার করিয়াছিল, উড়িষ্যার তালিবনশ্যাম-নীলাম্বু-বেলায় শিবির স্থাপন করিয়াছিল, এবং উত্তুঙ্গতরঙ্গ ভীষণ সাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলাদি বিজয় করিয়াছিল— বাংলার ত্যাগের আদর্শ তেমনই হিমারণ্যের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশে দেশবন্ধু দেশসেবাকে ধর্মের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তির পঞ্চপ্রদীপ নিষ্ঠার গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া তাহার আলোকে মার পূজা করিয়া আপনার জীবন পর্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। সেই বাংলায় কি কখনো ত্যাগী কর্মীর অভাব হইতে পারে? এ কথা বিশ্বাস করিয়া বাঙালী হইয়া বাঙালীর নাম কলঙ্ককালিমালিপ্ত করিতে পারি না। দধীচির মতো দেশবন্ধু আত্মত্যাগ

করিযা বাঙালীর ব্যবহারের জন্য অস্ত্রোপকরণ দিয়া গিয়াছেন। বাঙালী! তোমরা সবল বাহুতে সেই বজ্র ব্যবহার করো— অনাচার অত্যাচার মুহূর্ত-মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আজ আমি আবার স্বরাজ-সংগ্রামের জন্য সৈনিক ও সমর-সরঞ্জাম চাহিতেছি। আপনাদিগের উৎসাহ, আপনাদিগের উদ্যম, আপনাদিগের সংকল্প দৃঢ়তা, আপনাদিগের দেশভক্তিতে আমার আস্থা আছে। তাই আমার বিশ্বাস, আমার প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না।

সমবেত সভামণ্ডলী! আমাব বক্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। বলিবার অনেক কথাই ছিল, কিন্তু মনে হইতেছে কিছুই বলা হইল না। আপনারা যে এত ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। পরিশেষে আসুন একবার সকলে মিলিয়া দেশমাতৃকাকে স্মরণ করি। আসুন সমস্বরে মাকে ডাকি।

"মা যদি গংগায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন। মা তো আমাদের আর কোনো বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন। আবার আমরা এই সোনার বাংলার বুকে ও মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত হইয়া প্রাণ মন ঢালিয়া মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নীকৃতবাসে বলিব— জননী জাগৃহী।" বন্দেমাতরম্।

মার্চ ১৯২৯

তোমরা মরণজয়ী

মাননীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী—
আপনারা আমাকে ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতির পদ প্রদান করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন— কোন্ গুণ আমার আছে যাহার বলে আমি এই পদ দাবি করিতে পারি— তাহা আমি তো জানি না জানেন আপনারাই। আমার ছাত্রজীবন কিভাবে কাটিয়াছে, তাহা হয়তো আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন। জানিয়াও যদি আপনারা আমাকে ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতি করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি কী কথা বলিব তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন।

ছাত্রমণ্ডলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই; আমি চাই তাদের ভালোবাসা, আমি চাই তাদের আপন হইতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।

আমি ছাত্রদের ভালোবাসি। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাহাদের মনোভাব, তাহাদের সুখদুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বুঝি। ছাত্রজীবনে কী লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্রসমাজের মর্মের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি।

যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না— যে সমাজে ছাত্রেরা শিশুবৎ, কেবল কৃপার ও উপদেশের পাত্র— সে সমাজে মানুষ সৃষ্টি করা সহজ নয়। আমরা মুখে বলি— "প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"— কিন্তু ব্যবহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশু জ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া বি.এ., এম.এ. পাস করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র খোকার ন্যায় ব্যবহার পায়— এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আর দুঃখের বিষয় এই, আমরা এরূপ ব্যাপারে লজ্জা বোধ না করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসিলে কি বিস্মিত হইবার হেতু আছে?

হিন্দুজাতি গর্ব করিয়া থাকে যে তাহারা মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া

ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বালক-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবান পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দু জাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়া বলুন— "আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা— এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার ও শিক্ষা পায় কিনা ?"

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাংলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারীসমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্তমনে তাহা সহ্য করিত না। আজ যদি বাংলাদেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইত এবং বীর-শ্রেষ্ঠ খড়্গবাহাদুর সিংহের মতো প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান-রক্ষার্থে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরেজকে তোমরা হয়তো গালাগালি কর, ইংরেজকে তোমরা হয়তো ঘৃণা করিয়া থাক — কিন্তু আমি বলি, ইংরেজ যেরূপ তাহার নারী জাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা করো ইংরেজের নিকট। তোমার দেশে তোমাব মা ও ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা হয় না— আর মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরেজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে ? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরেজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরেজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মিস্ এলিসের পাঠান-কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি ? জননীকে ভালোবাসিবার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়— সমস্ত মাতৃ-জাতিকে ভালোবাসা। বাংলাদেশ—বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাণধর্ম— বাংলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাংলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না — সে বাংলাদেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে ? যে ব্যক্তি বাংলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না— ভালোবাসে না — সে কী করিয়া মানুষ হইবে ? মহান্ আদর্শকে যে ভালোবাসে না— যে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত

হইয়া উঠিয়াছে— সে পাত্রকে যে ভালোবাসে না— সে ব্যক্তি কোনোদিন মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে যাহা-কিছু পবিত্র, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর— সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি দেশ-মাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবনমনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ; মাতৃজাতিকে ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃতসংকল্প হও। মনে রাখিয়ো সেই কথা— যাহা বহুযুগ পূর্বে মনু বলিয়াছিলেন—

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বিবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥

"যেখানে নারী পূজিতা হন সেদেশে দেবতারা লীলা করিয়া থাকেন; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সেদেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনো দুঃখ কষ্ট শোক নাই— সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।" যে যুগে এদেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী-গার্গীর মতো ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে ক্ষণা-লীলাবতীর মতো বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান্সীর রানীর মতো বীর রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। সোনার বাংলায়ও আমরা একদিন রানী ভবানী ও দেবী চৌধুরানীর মতো রমণী দেখিয়াছিলাম।

আমার ছাত্রবন্ধুরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছাত্রসম্মিলনীতে আমি এ-সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি। কিন্তু বড়ো ব্যথা পাইয়া এ কথা আজ আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নারীসমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে সে পর্যন্ত আমরা জাতিহিসাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃজাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এদেশের নারীজাতি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রী জাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; অবরোধ-প্রথা দূর করিতে হইবে; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও

ছোরাখেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে— এমন-কি, স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে। যদি এসমস্ত নীতি কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কার-বশত যাঁহারা ধর্ম ও লোকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই-সব প্রাচীনপন্থীরা হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব করা তদপেক্ষা কঠিন। কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে, বিদেশীদের সঙ্গে, বাহিরের সঙ্গে ; এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত -নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারা-যন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্যপ্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয়— দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনোদিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের অবস্থার মতো হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা করো।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনো যুবক সমাজ ও ছাত্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পায় নাই। অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করি না ; কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট, পুলিসের নিকট, গভর্নমেন্টের নিকট এবং সমাজের নিকট যে সমাদর— এমন-কি, শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে, তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে। আর আমাদের ছাত্রেরা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র ; বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবালকের তুল্য ; এবং পুলিশ ও গভর্নমেন্টের নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কি করিয়া সম্ভব ? স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ

যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, কর্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয়। আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে আমাদের ছাত্রেরা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়।

তবে আশার কথা এই যে, এখনকার ছাত্রেরা আর নিশ্চেষ্ট নয়। সমাজের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা নিজেদের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ছাত্র-সমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এদেশের ছাত্রসমাজ ক্রমশ অর্জন করিবে নিজের শক্তি, সাধনা ও যোগ্যতার বলে। শ্রীযুক্ত খড়্গবাহাদুর সিংহের মতো ছাত্র আজ সমস্ত দেশে সকল শ্রেণীর নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করিয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শক্তির বলে। ঠিক এমনইভাবে বাংলার ছাত্রসমাজ ক্রমশ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

মানুষের উন্নতির পথে সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্তরায় ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষ যখন কোনো সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোনো নীতির দোহাই দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। বর্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"— অধ্যয়নই ছাত্র-জীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগকে দেশসেবার কার্য করিতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন কোনোদিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাস। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে-- হয়তো বড়ো চাকুরি পাইতে পারে— কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি— এ কথা সত্য, কিন্তু সে সব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা— শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদ্ভাবভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া

যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পেঁছায তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা যে নূতন পথে নূতনভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। যখন মানুষের অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত কল্পনাশক্তি ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষ যখন ভালোবাসিতে পারে— তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারে— অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ভাবের তরঙ্গে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিতে পারে। সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাটকা রাঙা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে; পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি, হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদের হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম রাগে রঞ্জিত— সেই শুভ-সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ করো।

সে আদর্শ কি— যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, যাহার পুণ্য-পরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড়ো হইয়াই জন্মায়— তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড়ো হইতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহারা সে মহত্ত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যসমাজকে মুগ্ধ করিবে।

যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাংলার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব-বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলি—

"হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।"

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব— ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মতো সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষাদীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে— সে ব্যক্তির দিবার মতো সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনো অর্থ নাই ; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাস ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজকাল স্কুলে ও কলেজে "ভালো ছেলে" নামে একশ্রেণীর জীব পাওয়া যায় ; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট— পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবার্ট ক্লাইভকে। এই "বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো" ছেলে সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরেজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে।

ইংলন্ডের ভালো ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল "বকাটে" রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখিতে জানে তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। "বকাটে" রবার্ট শেষ জীবনে হইল লর্ড ক্লাইভ।

ইংরেজ— তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে ইহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান

অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমত, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে এবং দ্বিতীয়ত, তাহাদের spirit of adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে; বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও "সুদূরের পিয়াসী" আছে বলিয়াই ইংরেজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মবিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সংকোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে; তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে সম্পদ যাহা-কিছু আছে তাহা বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।...
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া।
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান॥

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা কোনো বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগির পালোয়ান— পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীন না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা জাতি হিসাবে এখনো অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনো জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদেব মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণ সমাজ লাভ করিতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ববিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণবিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানেই নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জংগলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না— পাইব নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা— পাইব অবিরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়— সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজ তোমাদের মতোই একজন ছাত্র খড়্গবাহাদুর সিংহ মাতৃজাতির সম্মান রক্ষায় পুরস্কারস্বরূপ বরেণ্য বীররূপে ভারতপূজ্য হইয়াছে। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরে যে-সব Gold medalist ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একত্রিত করিলেও একজন খড়্গবাহাদুর তৈয়ারি হইবে না।

স্কুলে, কলেজে, ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মতো গিয়া বাধা দাও। মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে— চিরকালের জন্য জীবনের স্রোতে সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে— সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

আর-একটি কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব। ছাত্র-সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের উদ্ধার যে তাহাদেরই করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যে তাহাদের আছে— এ কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর বিশ্বাস না পাইলে মানুষ কোনো বড়ো কাজ করিতে পারে না। বাংলার তরুণ সমাজের উপর— ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি— তাই তারাও আমাকে ভালোবাসে। ছাত্রবন্ধুগণ— তোমাদের মধ্যে কী অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যেদিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যেদিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যেদিন মরণজয়ী হইবে সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় সে-সব-সংবাদ পাইবে; আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে। নিজেদের মধ্যে esprit d' corps বা সংঘবদ্ধতার অনুশীলন করিতে হইবে —ছাত্র-সমাজোপযোগী গান বাঁধিতে হইবে, পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য তৈরি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে— যেমন কলিকাতা-কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। এই volunteer organisation-এর সাহায্যে

ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্তিতা। এই-সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংহত শক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism-এর সৃষ্টি হইবে। এই class patriotism-এর আবশ্যকতা রহিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এই সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোনো বাধাবিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম, এখনো ছাত্র আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তোমরা গ্রহণ করো। বন্দেমাতরম্।

এপ্রিল ১৯২৯

দেশাত্মবোধই জাতির আদর্শ

আপনাদের অনুরোধে, আপনাদের আদেশে আমি এই সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একজন সভাপতি না থাকিলে সভার অধিবেশন হয় না। কিন্তু আমি আশা করি আপনারা শুধু প্রথা বজায় রাখিবার জন্য আমাকে সভাপতিপদে মনোনীত করেন নাই।

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিয়াছি। জ্ঞানের সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতা লাভ করে— তাহাও বোধহয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি আজ এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে পলিত-কেশ না হইলে মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী মি. র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ড্ বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্তু এই ইংলন্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ যুবক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে তুর্কী, ইটালী, চীন প্রভৃতি বহু নবজাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে সংরক্ষণেরই বেশি প্রয়োজন— যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাজ— সে ক্ষেত্রে আপনি প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিতদন্ত পলিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি— ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদেরই ডাক পড়িয়াছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা কাঁচা, যাহারা আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া।

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনো অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে youth is a crime, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মতো ত্রুটি বা অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার।

তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্মণ্যতা বা অবিমৃশ্যকারিতা নয়— এ কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

আজ বয়োজ্যেষ্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যুবকেরা যদি এই সংকল্প করে যে তাহারা স্বীয় চরিত্রগুণে, সেবা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা, বয়োজ্যেষ্ঠগণের হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে?

পৃথিবীব্যাপী যে যুব-আন্দোলন বা Youth movement এখন চলিতেছে ইহার স্বরূপ কী, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কী—সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলের নাই। যুবক ও যুবতীরা সংঘবদ্ধ হইয়া যে-কোনো আন্দোলন শুরু করিলে সে আন্দোলন যে "যুব-আন্দোলন" আখ্যার যোগ্য হইবে— এ কথা বলা যায় না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব-আন্দোলদের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনো বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষত যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে— সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে— ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।

যুবকদের বর্তমান যুগে কী করা উচিত সে-বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়া আমি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটি মূলকথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে— একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপর দিকে, সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একদিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (social qualities) বিকাশ হইবে— এ কথা মনে করা উচিত নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক

প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজগঠন-বিরোধী) বৃত্তি প্রায় প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণস্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যেদিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল সেদিন সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষলাভই আমাদের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

আমার নিজের মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি সমাজগঠন-বিরোধী বৃত্তির (anti-social quality) জন্যই আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে না পারার জন্য — কী সামাজিক ক্ষেত্রে, কী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে —আমরা কোনো দিকে উন্নতি করিতে পারিতেছি না। আমি চাই না যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা বিচারে গ্রহণ করেন। আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং ঐ আলোচনা হইতে আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের চরিত্রের দোষগুলি সর্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত জাতি সে-বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে।

বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে— এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। পাশ্চাত্য মনীষীরা কিন্তু কোনো ঘটনাকে সহজে "আকস্মিক" বা "অদৃষ্টসম্ভূত" বা "দুর্দৈব-সংঘটিত" বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। প্রত্যেক জাতির উত্থান ও পতনের অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য কারণ বা নিয়ম আছে— এ কথা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া আপনারা আর-একবার ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন ; anti-social বা সমাজগঠন-বিরোধী ও anti-national বা জাতিগঠন-বিরোধী কী কী বৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা সমস্ত জাতিকে বলিয়া দিন। তারপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। তখন দেখিবেন যে আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্য একবার ফিরিয়া আসিলে —কী ব্যক্তিগত, কী সমষ্টিগত— আমাদের সকল সাধনাই জয়যুক্ত হইবে।

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশি জোর দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনোদিনই ব্যক্তিগত সাধনা ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনোদিনই ত্যাগ করি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যেও যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনো জন্মাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির চেষ্টা আমাদের জাতি কোনোদিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective Sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা— সে সাধনার কোনো সার্থকতা নাই। তাই সমাজগঠন-বিরোধী ও জাতিগঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মতো আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার তরুণ সমাজকে রুদ্রের মতো বলিতে হইবে— জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তিনিচয় আমরা কুসংস্কারজ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্মূল করিব।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্য-জীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না— মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে— ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্ম-বলিদান করিতে পারিলে— মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য— একসূরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শসূত্রে গ্রথিত হইবে, সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বর্তমান যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে দেশাত্মবোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা এই

আদর্শের অনুকূলে তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয় ; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য।

নূতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা গতানুগতিক পন্থা বর্জন করিয়া সর্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমরা যেন "অজানার" ভয়ে সর্বদা ভীত ; বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালোবাসি, তাই আমাদের spirit of adventure এত কম। কিন্তু এই spirit of adventure— যাহার এত অভাব আমাদের মধ্যে— সকল জাতির উন্নতির এইটিই একটা কারণ। আমি বাংলার তরুণ সমাজকে তাই বলিতে চাই— বাহিরের জন্য, নূতনের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখিতে হইবে। ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে।

আমাদের অসীম শক্তি আছে— নাই আমাদের আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা সে একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে ; আমরা নিজেরাই অবাক হইব এত শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। এই নবজাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"— এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্যসত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না ; কোনো বাধা-বিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ— এসো আমরা একসঙ্গে বলি—"আমরা মানুষ হব ; নির্ভীক, মুক্ত, খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজরাজেশ্বরী হবেন ; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনো

বাধা আমরা মানব না ; কোনো ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব, ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব।" এসো ভাই, আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলি— "পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ; জননি জাগৃহি।" বন্দেমাতরম্‌।

জুন ১৯২৯

তোমরা ওঠো জাগো

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমেবত ছাত্রমণ্ডলী :

আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন। তবে এই সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে আমার হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমি মনে করি আমি আপনাদের মতোই একজন ছাত্র ; "জীবনবেদ" আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত।

জাতির আদর্শ

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সেই ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই idea-কে সার্থক-করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তাহার জীবন অর্থহীন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আদর্শের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি একদিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবৎসরব্যাপী হইয়া থাকে, জাতির জীবনেও সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন যে আদর্শ একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি আছে।

আমাদের যুগধর্ম

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করিতেছে আমরা তার পরিচয় সবসময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহ্যঘটনা-পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীরূপা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম— the idea of the age. ইহার উপলব্ধি সব সময়ে হয় না বলিয়া আমরা প্রায়শ ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই— ভ্রান্ত গুরুর অনুবর্তী হই। হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও— তবে ভ্রান্ত গুরু ও

ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করো। নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাংলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী ষড়রিপু জয় করিয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুধু বুদ্ধ-জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল— ব্যক্তিত্ব বিকাশ. তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন "man making is my mission"— খাঁটি মানুষ তৈয়ারি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজির জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূলভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণদেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

রাজা রামমোহনের যুগ

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বে যখন আমাদের দেশে নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যে-সব অধর্ম চলিতেছিল, যে-সব আবর্জনা ও কুসংস্কার ধর্মের নামে সমাজ-দেহকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিন্দুসমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদান্তের সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজ ধর্মের বহিরাবরণ বর্জন করিয়া সত্য ধর্ম আশ্রয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এবং ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে, আগে চিন্তাজগতে আলোড়ন সূচনা করা দরকার— তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের যুগ

ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবর্তিত করিলেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের যুগে সমাজ-সংস্কারের কাজ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাণীর প্রভাবে সমগ্র দেশে নবজাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যেও জাগরণের সূচনা হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল।

স্বামীজির বাণী

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনো দেখা দেয় নাই— কারণ তখনো ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছে যে ইংরেজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা divine dispensation। ঊনবিংশ্ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। "Freedom, Freedom is the song of the Soul!" এই বাণী যখন স্বামীজির অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া— এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন, অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচার ভারতের জাতীয়তার ভিত্তিরূপে সংস্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া, বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি জাতিকে একটা সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরো দূরে সরিয়া গেল। তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।

অরবিন্দের বাণী

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিন্দের মুখে আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাই। অরবিন্দ যখন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখিলেন "We want complete autonomy, free from British control"— তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙালী বুঝিল যে এতদিন পরে সে মনের মতো মানুষ পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর হইল। এখনো কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন—

"I should like to see some of you becoming great; great, not for you own sake, but to make India great— so that she may stand up with head erect among the free nations of the world."

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড়তুফান অগ্রাহ্য করিযা, বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

মহাত্মাজীর নূতন বাণী

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পেঁাছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে আমবা আর-একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে— "জন-সাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে পাবে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাংলাদেশে নূতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরেব অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে "গণবাণী" মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায় তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কথা।

দেশবন্ধুর আদর্শ

এই বাণী আরো পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে যে-স্বরাজ তিনি লাভ কবিতে চান— তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে— তাহা সকলের জন্য,

জনসাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses"— এই আদর্শ তিনি নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

আর-একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই। এই যে মানুষের জীবন— জাতির এবং ব্যক্তির জীবন— ইহা একটি অখণ্ড সত্য। এই জীবনকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা সব দিক দিয়া জাগে, সর্বক্ষেত্রে তাহার নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজগৎ তথা মনুষ্যজীবন— বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের লোপ করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না— বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের দিকে চলিব। তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং জাতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতে "এক" এবং "বহুর" মধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন— সে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাধন করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু "শিক্ষার মিলনে" যেরূপ বিশ্বাস করিতেন "শিক্ষার বিরোধে"ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন— এক কথায় তিনি Federation of cultures-এ বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও বাংলার বৈশিষ্ট্যেও বিশ্বাসবান ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের centralised State অপেক্ষা federal State বেশি পছন্দ করিতেন।

স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ

যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এই যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপ আগে দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনো জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের তরুণ সমাজকে বলিয়া দিতে হইবে যে, যে-স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি সে রাজ্যে সকলে মুক্ত— ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি— এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানবজাতিকে, দেশবাসীকে মুক্ত করিতে চাই।

পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ

যাহারা মনে করে রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে— অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব আনিবে না— তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ পূর্বশ্রী ফিরিয়া আসে— মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না— thus far and no further.

আমাদের এই শতছিদ্রযুক্ত, পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কোনোদিন হইবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা (complete independence) লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড়ো সত্য— সে ব্যক্তি এই-সব অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে কেন?

আজ এই কথাটি আমি খুব বড়ো করিয়া এখানকার ছাত্রসমাজের মধ্যে বলিতে আসিয়াছি— যে যুগে আপনারা জন্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম— পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তি লাভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জাতি জন্মিতে চায়— বর্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। 'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে'— এ অবস্থা আর কতদিন চলিবে। আমাদের নারীসমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা আর কতদিন বলিব—

'অচল হয়েও সচল সে যে
বস্তার চেয়েও ভারী।
মানুষ হয়েও সঙের পুতুল
বঙ্গদেশের নারী।'

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাঁসিকাষ্ঠের। সামাজিক

স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দেখিতে পান উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা। কিন্তু আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়ে ভীত নহি। মানুষের মধ্যে যদি ভগবান বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে ; যদি ভগবান সত্য হন— যদি মানুষ সত্য হয়— তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার মদিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হই তাহা হইলেও অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে দাবি— তাহা ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবি বৈ আর-কিছু নয় (the right to make mistakes), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা না দেখিয়া মুক্তিপথে আগুয়ান হও ; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও।

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড়ো সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে— নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথাকথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বলো— তোমরাও মানুষ ; মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাও পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের প্রাপ্য অধিকার করিয়া লও।

অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও

হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী ; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ করো। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে— অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন করো এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চার করো ; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক !

যেদিন ভারত পরাধীন হইয়াছে— সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা (Collective Sadhana) ভুলিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে ! ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই— এ কথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আমাদের জাতির বহু লোক— পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করিয়া আসিতেছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে নাই। আজ হইতে তাহাকে অধিকারী করিয়া দিতে হইবে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই— সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবি, সমান সুযোগ। যেদিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সেদিন সমস্ত সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর, উন্মত্ত হইবে।

অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখন চাই নূতন রক্ত। ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ— বহুবার রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত-সংমিশ্রণেব ফলে ভাবতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বর্ণসংকরে ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানব-বিজ্ঞান (anthropology) সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিবে এবং এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব।

সকলকে জাগাও

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা-মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো। স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধরো। স্বাধীনতার পূর্ব স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে। এই স্বাদ— এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই। নিজে অন্তরে এই আলোক জ্বালো— সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর দ্বারবর্তী হও। যাও চীনা ছাত্রদের মতো— রুশ তরুণদের মতো— চাষীর পর্ণ কুটীরে, মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে। তাহাদের জাগাও। আর যাও— মাতৃ-জাতির সমীপে। যাঁহারা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ হইয়াছেন 'অবলা'— তাঁদেরও জাগাও— বলো—.

'আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধরো।'

সর্বোপরি যাও দলে দলে বাংলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বলো— 'ভাই, এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে —মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য, এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো— এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা।'

জিজ্ঞাসা করি— এ কাজ করতে পারবে? হ্যাঁ পারবে, অবশ্য পারবে। তোমরা পারবে এ কাজ করতে— এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি। এগিয়ে চলো— জয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক— ভারত আবাব মুক্ত হউক— তোমাদের জীবনও সার্থক হউক।

বন্দেমাতরম্!

জুলাই ১৯২৯

আদর্শ সমাজের স্বপ্ন

পাঞ্জাবের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

পঞ্চনদের এই পুণ্য প্রদেশে আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা আমাকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি আপনারা আমাকে যে সম্মান ও অভ্যর্থনা দান করিয়াছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই। এখানে আমি যে সৌজন্য ও আতিথ্য লাভ করিয়াছি আমি যেন তাহার যোগ্য হইয়া উঠিতে পারি ইহাই আমার আজিকার কামনা।

আপনারা আমাকে দূরে কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া আমার কথা বলিতে বলিয়াছেন। আজ আমি এখানে আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিব বলিয়া আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আপনারা আমাকেই বা ডাকিয়াছেন কেন? ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতকে একত্রে মিলিত হইতে হইবে— এই বোধ হইতেই কি আপনারা আমাকে ডাক দিয়াছেন? বিদেশী শাসনের অধীন সর্বপ্রথম হইয়াছিল বাংলা, সর্বশেষ হইয়াছিল পাঞ্জাব। এই দুই প্রদেশের পারস্পরিক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বলিয়া কি আমার ডাক পড়িল? না কি, আপনারা এবং আমি একই ভাবনার শরিক, আমরা একই আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি— এই সমভাবের দরুনই কি আমাকে ডাকিয়াছেন?

আর নিয়তির কী পরিহাস— যে-আমি একদা ছাত্রাবস্থায় ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলাম — সেই আমাকেই লাহোরে ছাত্র-সমাবেশে ভাষণ দিতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। প্রবীণেরা যদি বলেন যে বেয়াড়া সময় আসিয়াছে, এখন অদ্ভুত লোককে ও অভিনব ভাবধারাকে জগতের লোক সমাদর করিতেছে— তবে কি আপনারা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? আমার অতীত জীবনের কথা সব জানিয়া শুনিয়া যদি আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন তবে তো আপনারা বুঝিয়াই লইয়াছেন যে আপনাদের কাছে আমি কী ধরনের কথা বলিব।

বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন যদি আরম্ভেই আমি পাঞ্জাব,

বিশেষত পাঞ্জাবের যুবকদের প্রতি আমার অন্তরের উদ্বেল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি। যতীন্দ্রনাথ দাস ও তাঁহার বাঙালী সহযাত্রীরা পাঞ্জাবের জেলে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জন্য আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্যই আমার এই কৃতজ্ঞতা। তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইবার ব্যবস্থা করা, যতদিন তাঁহারা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়াছিলেন ততদিন তাঁহাদের জন্য উদ্বেগ ও কাতরতা ভোগ করা, যতীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর যে সহানুভূতি, স্নেহ ও সম্মান আপনারা দেখাইয়াছেন তাহা বাঙালীর মর্মস্থলে আলোড়ন জাগাইয়াছে। লাহোরে বন্দী রক্ষা কমিটি যাহা করিয়াছেন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কমিটির সদস্যরা মহান শহীদের শবদেহ লইয়া কলিকাতা পর্যন্ত গিয়া আমাদের হাতে ঐ দেহ অর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা আবেগপ্রবণ জাতি। আপনাদের হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা যে আপনাদের প্রতি কত-দূর অনুরক্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। বাংলার এক ঘন তমিস্রার দিনে পাঞ্জাব তাহার জন্য যাহা করিয়াছে বাংলা তাহা চিরদিন মনে রাখিবে।

আপনাদের একজন বিশিষ্ট নেতা ডা. আলম একদিন কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন যে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হইয়া পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় এবং সূর্যাস্তের পর চন্দ্র পশ্চিম দিগন্তে উদিত হইয়া পূর্ব দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়। যতীনের জীবন ও মৃত্যুকে ইহার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিনি জীবিতকালে কলিকাতা হইতে লাহোর গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কলিকাতায় তাঁহার মৃত-দেহ আবার নীত হয়। মৃত মৃৎভাণ্ড রূপে নয়। পবিত্রতা, মহত্ব ও দিব্যতার প্রতীকরূপেই তাঁহার দেহ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল। যতীন আজ মৃত নয়। অনাগত কালের গতি-নির্দেশক রূপে আকাশপটে শুভ্র শুকতারা রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তিনি জীবিত আছেন তাঁহার অমর আত্মত্যাগ ও অনৈসর্গিক দুঃখবরণে। তিনি বাঁচিয়া আছেন স্বপ্ন রূপে, আদর্শ রূপে, মানবতার মধ্যে যাহা পবিত্রতম ও মহত্তম তাহার প্রতীক রূপে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি তাঁহার আত্মাহুতির মধ্য দিয়া শুধু ভারতের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন নাই—যে প্রদেশে তিনি জন্মিয়াছিলেন ও যে প্রদেশে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন এই দুই প্রদেশকে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক যুগের এই দধীচির তপস্যাক্ষেত্র আপনাদের এই মহান নগরী ; আমি তাই আপনাদের ঈর্ষা করি।

ক্রমে ক্রমে মুক্তির উষালগ্ন যত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে আমাদের দুঃখ ও বেদনার পাত্র ততই ভরিয়া উঠিতেছে। আমাদের শাসকরা যত দেখিতেছেন যে ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে ততই তাঁহারা অন্যান্য স্থানের স্বৈরতন্ত্রীদের মতোই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক। যদি তাঁহারা ক্রমশ সভ্যতার সব ভণিতা পরিহার করেন, দ্বিধাহীনভাবে পীড়ন চালাইতে ভদ্রতার মুখোশ খুলিয়া ফেলেন— তবে কেহ যেন বিস্মিত না হন। পাঞ্জাব ও বাংলা বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি নিপীড়ন ভোগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে আমরা স্বরাজ লাভের জন্য এইভাবে নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতেছি। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের মতো বীরদের অনুপ্রেরণা দমননীতির সাহায্যে দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না; বরং নিপীড়ন ও ক্লেশ, অপমান ও দুঃখবরণের ভিতর দিয়াই বীরচরিত্র গড়িয়া উঠিবে। তাই আসুন, আমরা সর্বান্তঃকরণে দমন-নিপীড়নকে স্বাগত জানাই। যখন উহা আসিবে তখন আমরা উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিব।

আপনারা হয়তো জানেন না পাঞ্জাবের অতীত ইতিহাস হইতে কত কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। পাঠকদের এইভাবে মনোরঞ্জন করা হইয়াছে। আপনাদের বীরদের কাহিনী লইয়া কবিরা কবিতা রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাহা করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে সেই-সব কবিতা আজ সুপরিচিত। আপনাদের সন্তদের বাণী ললিত বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলার অগণিত মানুষ সেই-সব বাণীতে সান্ত্বনা ও প্রেরণা খুঁজিয়া পায়। এই সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের অনুরূপ ঘটনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে। শুধু ভারতের জেলে নয়, সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে ও সমুদ্রপারে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাংলার ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক তীর্থযাত্রীরা পরস্পর মিলিত হইয়াছেন।

বন্ধুগণ, আজ এই আলোচনার সূত্রে আমি যদি কিঞ্চিৎ বিশদভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উহার উত্তর দিবার চেষ্টা করি তবে সেজন্য আমি ক্ষমা চাহিব না। আমি জানি এদেশে এমন লোক আছেন, এমন-কি কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে "পরাধীন জাতির কোনো রাজনীতি নাই" এবং ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু

আমার নিজস্ব মত হইল পরাধীন জাতির রাজনীতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। পরাধীন দেশে যে-কোনো সমস্যার কথাই আমরা ভাবি-না কেন, ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সব সমস্যারই মূলে আছে রাজনৈতিক সমস্যা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিতেন জীবন পূর্ণাঙ্গ এবং অর্থনীতি বা শিক্ষানীতি হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করা যায় না। জাতীয় জীবনের সকল দিক ও পর্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ফলত পরাধীন জাতির সকল দোষ ও ত্রুটির মূল খুঁজিলে আমরা দেখিব যে রাজনৈতিক হেতুই সকলের মূলে— আর সেই হেতু হইল রাজনৈতিক দাসত্বের হেতু। ফলে ছাত্ররা, কিভাবে আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিলাভ হইবে—এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি অন্ধ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থকীটের প্রয়োজন নাই

সাধারণভাবে জাতীয় কাজের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই; তাহা হইলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকিবে কেন তাহা আমরা বুঝি না। যদি সকল প্রকার জাতীয় কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে তবে তাহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন। যদি পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই মূলত রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া থাকে তবে সকল জাতীয় কর্মই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন। কোনো স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা নাই, বরং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এই উৎসাহ ইচ্ছা করিয়াই দেওয়া হয় কেননা ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ও নেতা গড়িয়া উঠেন। যদি ভারতে ছাত্ররা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে তবে আমরা কোথা হইতে রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ করিব, কোথায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিব? তা ছাড়া ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্মরহিত চিন্তা চরিত্র-গঠনেব পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং এইজন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক ইত্যাদি স্বাস্থ্যপ্রদ কর্মে অংশ গ্রহণ চরিত্র গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থকীট, স্বর্ণপদকধারী ও অফিস-কেরানী উৎপাদন করাতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়াসী

হইবে চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করিতে যাহারা দেশের জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অর্জন করিবে।

বর্তমান সময়ের অন্যতম আশার কথা এই যে সারা ভারতে একটি খাঁটি ছাত্র-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি মনে করি ইহা বৃহত্তর যুব-আন্দোলনেরই একটি পর্যায়। গত দশকের ছাত্র-সম্মেলনগুলির সঙ্গে বর্তমানের ছাত্র-সম্মেলনগুলির অনেক পার্থক্য হইয়াছে। পূর্বেকার ছাত্র-সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হইত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। ঐ সম্মেলনগুলির প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ থাকিত— রাজনীতির কথা মুখে আনিয়ো না।

এই সম্মেলনগুলির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের অধিবেশনগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ-সব অধিবেশনে প্রথম যে প্রস্তাব গৃহীত হইত তাহা হইল সম্রাটের প্রতি আমাদের আনুগত্য জ্ঞাপক প্রস্তাব। সৌভাগ্যবশত শুধু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই পর্বই নয়, ছাত্র-সম্মেলনের অনুরূপ পর্বও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। আজিকার ছাত্র-সম্মেলনগুলি অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দেন তাঁহারা ভারতীয় দণ্ডবিধি কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ইচ্ছা-মতো চিন্তা করিয়াও কথা বলিয়া থাকেন।

অসন্তোষের অনুভূতি

আজিকার যুব-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল অসন্তোষের অনুভূতি, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অসহিষ্ণুতা, নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তীব্র আকুতি। দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরতার ভাব এই আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। বর্তমান কালের তরুণরা বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে সকল দায়িত্বভার তুলিয়া দিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। বরং তাহারা মনে করে, দেশ ও দেশের ভবিষ্যতে প্রবীণদের যতটা অধিকার তাহার চেয়ে তাহাদেরই অধিকার বেশি। তাই দেশের পূর্ণতম দায়িত্ব গ্রহণ করা ও সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তোলা তাহাদের পরম কর্তব্য। ছাত্র-আন্দোলন বৃহত্তর যুব-আন্দোলনেরই একটি পর্যায় ও অংশ। তাই যুব-আন্দোলনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও উদ্দেশ্য তাহা দ্বারাই ছাত্র-আন্দোলনও অনুপ্রাণিত।

আজিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িত্বহীন বালক-বালিকাদের আন্দোলন নয়, সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে দেশের সেবার জন্য নিজেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া

তোলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, পূর্ণ তৎপর ও দায়িত্বশীল নরনারী এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। এই আন্দোলন দুই প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। কিংবা দুই প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করা ইহার কর্তব্য। প্রথমত, ছাত্রদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ও তাহাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ নাগরিক— এই কথা মনে রাখিয়া, যাহাতে তাহারা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হয় সেইরূপে তাহাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। জীবন-রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলে তাহারা যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবে, যে-সকল কর্মে তাহাদেব লিপ্ত হইতে হইবে, তাহার পূর্বাস্বাদ তাহাদের দিতে হইবে।

বিশেষ প্রয়োজন

ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম যে দিকটির কথা আমি বলিয়াছি ক্ষমতাসীনরা সাধারণত তাহা বিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আন্দোলনের অপর যে দিকটির কথা আমি বলিয়াছি তাহা নিরুৎসাহিত ও নিন্দিত করা হইবে, কখনো কখনো তাহা পণ্ড করিয়াও দেওয়া হইবে। প্রথমে কী করা আপনাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে বিশদ কর্মসূচী দিবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই। তাহা নির্ভর করিবে অংশত আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন ও চাহিদার উপর, অংশত শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ঐ-সব প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার কী ব্যবস্থা করেন তাহাব উপর।

প্রত্যেক ছাত্রকেই সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, উন্নত চরিত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞান ও সুস্থ গতিশীল ভাবধারায় পূর্ণ মস্তিষ্কের অধিকারী হইতে হইবে। কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে যদি ছাত্রদের দৈহিক, চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ যথাযথভাবে না হয় তবে সেই বিকাশ সম্ভব করিয়া তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা আপনাদেরই করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ যদি আপনাদের সেই প্রয়াসকে স্বাগত জানান উত্তম; যদি স্বাগত না জানান তবে তাঁহাদের অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনারা আগাইয়া যান। আপনাদের জীবন আপনাদেরই, উহার বিকাশ সাধনের দায়িত্বও আপনাদের। অপর কাহারো অপেক্ষা এ-বিষয়ে আপনাদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। উহার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতেছি। শুধুমাত্র ছাত্রসমাজেরই হিতার্থে ছাত্র-অ্যাসোসিয়েশন নিজ নিজ এলাকায় সমবায়মূলক স্বদেশী বিপণি খুলিতে পারে। ছাত্ররা যদি এই-সব বিপণি ভালোভাবে চালায় তবে একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একদিকে ছাত্ররা সুলভে স্বদেশী পণ্য পাইবেন ও তাহার ফলে আমাদের দেশী শিল্পের উপকার হইবে। অপর পক্ষে, ছাত্ররা সমবায় সমিতি চালাইবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে এবং লব্ধ মুনাফা ছাত্র-সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্যয় করা যাইবে।

ছাত্রদের কল্যাণসাধনের জন্য আপনাদের কর্মসূচীতে— শারীরচর্চা সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, বিতর্কসভা, পত্রিকা, সংগীতচর্চা, লাইব্রেরি, ও রীডিং রুম, সমাজ-সেবা লীগ ইত্যাদি বিষয়গুলিরও স্থান হইতে পারে।

আদর্শ সমাজের স্বপ্ন

ছাত্র-আন্দোলনের আর একটি দিক— এবং সেইটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক— হইল ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দান। এই প্রশিক্ষণ হইবে একই সঙ্গে বুদ্ধিগত বৌদ্ধিক ও বাস্তবধর্মী। ছাত্রদের সামনে আদর্শ সমাজের একটি স্বপ্ন রাখিতে হইবে। ছাত্রদের নিজ জীবনেই ঐ স্বপ্ন রূপায়িত করিতে হইবে। তাহাদের নিজেদেরই একটি কর্মসূচী নির্ণয় করিতে হইবে ও সাধ্যমতো সেই কর্মসূচী অনুসরণ করিতে হইবে। ছাত্ররূপে তাহাদের কর্তব্য পালনের সময় ছাত্র-পরবর্তী জীবনের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজের এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যই সংঘর্ষ দেখা দিবে কিনা তাহা অনেকাংশে নির্ভর করিবে শিক্ষা-পরিচালক কর্তৃপক্ষের মনোভাবের উপর। দুর্ভাগ্যবশত সংঘর্ষ যদি দেখা দেয়ই তবে করিবার কিছুই নাই এবং ছাত্রদের চিরতরে মনস্থির করিয়া ফেলিতে হইবে যে শিক্ষা-পরবর্তী উত্তর-জীবনের জন্য চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তোলার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ও আত্মনির্ভর তাহারা হইবে কি না।

যে আদর্শ আমাদের সকলের গ্রহণযোগ্য সে আদর্শ কী তাহা বলিবার আগে আপনাদের অনুমতি লইয়া আর একটি বিষয়ে বলিব—যাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্তমানে এমন কোনো এশিয়াবাসী নাই, ইউরোপের

পদতলে শায়িত এশিয়াকে দেখিয়া যিনি ব্যথা ও অপমান অনুভব না করেন। কিন্তু এশিয়া যে চিরদিন এমন হতমান অবস্থায় ছিল এ-হেন ধারণা আপনারা চিরতরে পরিহার করুন। আজ ইউরোপ সভ্যতার শীর্ষদেশে রহিয়াছে—কিন্তু এমন দিন ছিল যখন এশিয়াই ছিল সভ্যতার চূড়ায়। ইতিহাস বলিতেছে অতীত যুগে এশিয়া ইউরোপের বিরাট অংশ দখল করিয়া লইয়াছিল, সে সময় এশিয়ার নামে ইউরোপ ছিল আতংকগ্রস্ত। এখন অবস্থা পালটাইয়াছে। কিন্তু নিয়তিচক্র আবার ঘুরিতেছে। তাই নৈরাশ্যের কোনো কারণ নাই। বর্তমান মুহূর্তে এশিয়া দাসত্বের নিগড় ভাঙিবার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। সেদিন দূরে নাই যখন নবজাগ্রত এশিয়া অতীতের তমিস্রালোক হইতে শক্তি ও গৌরবে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, স্বাধীন জাতিসমূহের সভামধ্যে তাহার সংগত স্থান গ্রহণ করিবে।

পশ্চিমী বাগ্‌বিশারদেরা অমর প্রাচীকে "পরিবর্তনহীন" বলিয়া দোষ দিতেছে :— একসময় যেমন তুরস্ককে তাহারা বলিত ইউরোপের রুগ্‌ণ লোক। কিন্তু তুরস্ক সম্পর্কে আর এ কথা যেমন খাটে না, এশিয়া সম্পর্কেও ঐরকম সাধারণ মন্তব্য আর করা চলে না। জাপান হইতে তুরস্ক পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া হইতে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র প্রাচী আলোড়িত হইতেছে। সর্বত্রই দেখা যাইতেছে পরিবর্তন, প্রগতি, প্রথা কর্তৃপক্ষ ও ঐতিহ্যের সংগে সংঘাত। প্রাচী যতদিন পরিবর্তন কামনা না করে ততদিনই তাহার পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু সে যখন চলিষ্ণু হইবার সংকল্প করিবে তখন পাশ্চাত্য জাতিগুলির চেয়ে দ্রুততর গতিতে সে আগাইয়া চলিবে। বর্তমানে এশিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে।

আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়, এশিয়ায়— বিশেষত ভারতবর্ষে— আমরা যে কর্মচাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখিতেছি তাহা কি প্রকৃত জীবনের লক্ষণ, নাকি বহিরাগত প্রেরণার প্রতিক্রিয়া মাত্র। মৃত জীবনকোষও বহিরাগত প্রেরণায় সাড়া দেয়। মৃত মাংসপেশীর সংকোচন-প্রসারণের মতোই আমাদের আন্দোলনও উত্তেজনামাত্র কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস জীবনের লক্ষণ সৃষ্টিশীলতায়। এবং যখন আমরা দেখিতেছি বর্তমানকালের আন্দোলনগুলির মধ্যে মৌলিকতার ও সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান, তখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারি জাতি হিসাবে সত্যই আমরা বাঁচিয়া আছি জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের নবজাগরণ যথার্থই আত্মার জাগরণ।

বর্তমানে ভারতে আমরা ভাবধারার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বাস করিতেছি। চারিদিক হইতে বিচিত্র বিরুদ্ধ ও অন্তঃসলিলা স্রোত বহিয়া আসিতেছে। এক বিচিত্র মিলন-মিশ্রণ চলিতেছে। ভাবধারার যে বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বসিয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় স্থির করা সম্ভব নয়। আমরা যদি ইতিহাসের রায় অগ্রাহ্য না করি, স্যার ফ্ল্যান্ডার্স পেত্রির মতো চিন্তাবিদের সুবিবেচিত মত উপেক্ষা না করি, তবে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাতন ও জীর্ণ সভ্যতাগুলিরও পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। আপনারা যদি আমার এই মত সমর্থন না করেন তবে সভ্যতার উত্থান ও পতনের পিছনে কোন্ নিয়ম বর্তমান তাহা আপনাদেরই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এই নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলে তবেই আমরা দেশবাসীকে বলিতে পারিব, দেখুন, আমাদের এই প্রাচীন দেশে নূতন, স্বাস্থ্যবান ও প্রগতিশীল জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদের কী করিতে হইবে।

যদি আমাদের ভাবজগতে আমরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে চাই তবে আমাদের সম্মুখে এমন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে যাহা আমাদের সমগ্র জীবনকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিবে। স্বাধীনতাই সেই আদর্শ। কিন্তু স্বাধীনতা কথাটির বিচিত্র অর্থ আছে, আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণা ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ;— ব্যক্তির মুক্তি ও সমাজের মুক্তি ; পুরুষের মুক্তি ও নারীর মুক্তি ; ধনীর মুক্তি ও দরিদ্রের মুক্তি ; সকল ব্যক্তির মুক্তি ও সকল শ্রেণীর মুক্তি। স্বাধীনতা বলিতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় না। ধনের সম-বণ্টন, জাতিপ্রথা ও সামাজিক অন্যায়ের, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অবসানও বুঝায়। কঠোর বাস্তবপরায়ণ পুরুষ ও নারীর কাছে এই আদর্শ হয়তো স্বপ্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে— কিন্তু একমাত্র এই আদর্শই আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে পারে।

আমাদের জাতীয় জীবনের যত দিক আছে স্বাধীনতারও তত দিক আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা স্বাধীনতার কথা যখন বলেন তখন স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের কথাই বলেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা কাটাইয়া উঠিয়া উহার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ ধারণা গ্রহণ করিতে আমাদের

কয়েক দশক সময় লাগিয়াছে। যদি সত্যই আমরা স্বাধীনতার পূজারী হই এবং কোনো স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়, স্বাধীনতার জনাই স্বাধীনতা ভালোবাসি, তাহা হইলে আমাদের এ কথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি বুঝায় এবং শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতা নয়, সমগ্র সমাজের স্বাধীনতাও বুঝায়। ইহাই এ যুগের আদর্শ এবং যে স্বপ্ন আমার আত্মাকে অধিকার করিয়াছে তাহা হইল পূর্ণ, স্বাধীন ও মুক্ত ভারতের আদর্শ।

স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় হইল স্বাধীন মানুষরূপে নিজেদের গণনা করা, অনুভব করা। আমাদের অন্তরে পূর্ণ বিপ্লব ঘটা চাই। মুক্তির মদে আমাদের মাতাল হইতে হইবে। মুক্তির মদে মাতাল নরনারীই মানবতার মুক্তি সাধন করিতে পারিবে। যখন "মুক্ত হইবার ইচ্ছা" আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে তখনই আমরা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিব। সাবধানী বাণী আর আমাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সত্য ও গৌরবের আহ্বান প্রিয় লক্ষ্যের অভিমুখে আমাদের লইয়া চলিবে।

বন্ধুগণ, আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি যাহা ভাবি, অনুভব করি, স্বপ্ন দেখি, আমার সকল কর্মের পিছনে যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা বর্তমান, তাহা আমি আপনাদের কাছে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানি না ইহা আপনাদের ভালো লাগিল কিনা। কিন্তু একটি বিষয় আমার নিকট খুব স্পষ্ট— জীবনের একটিই উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আছে— তাহা হইল সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তির ক্ষুধাই হইল আত্মার সংগীত। নবজাতকের প্রথম ক্রন্দনধ্বনি, যে বন্ধনের মধ্যে সে আসিয়া পড়িল উহার বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ ঘোষণা। আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যে ও আপনাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে মুক্তির এই তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়া তুলুন— আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ভারত তাহা হইলে অচিরে স্বাধীন হইবে।

ভারত স্বাধীন হইবেই— সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই। নিশাবসানে যেমন দিবসের আবির্ভাব অনিবার্য ইহাও তেমনি অনিবার্য। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা ভারতকে আর বেশিদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু আসুন, আমরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখি যাহার জন্য আমরা আমাদের সর্বস্ব— এমন-কি জীবনও— দান করিতে পারি। যাহার জন্য আমাদের প্রিয়জনদেরও ডালি দিতে হইতে পারে। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার

কী ধারণা তাহা আমি আপনাদের বলিয়াছি এবং কোন্ ভারতবর্ষ আমি গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাও আমি আপনাদের বলিয়াছি। পূর্ণ মুক্ত ভারত বিশ্ববাসীর কাছে মুক্তির নববাণী প্রচার করুক।

আমাকে হয়তো উগ্র জাতীয়তাবাদী বলা হইবে, তবু আমি বলিব যে ভারতের একটি মিশন আছে যাহা তাহাকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে, ঐ মিশনের জন্যই ভারত বাঁচিয়া আছে। এই 'মিশন' কথাটির মধ্যে কোনো রহস্য নাই। মানবজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে— বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতায়, ভারতকে কিছু মৌলিক অবদান রাখিতে হইবে। তাহার বর্তমান অবনতি ও দাসত্বের মধ্যেও সে যে অবদান রাখিতেছে তাহাও তো কম নয়। একবার ভাবিয়া দেখুন আপন পথে ও আপন প্রয়োজনানুসারে বিকাশলাভের স্বাধীনতা যখন সে ফিরিয়া পাইবে তখন তাহার অবদান কত মহৎ হইবে।

এ দেশে এমন লোক আছেন— তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ ও সম্মানী ব্যক্তি— মুক্তির আদর্শের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে তাঁহারা সম্মতি দিবেন না। তাঁহাদের খুশি করিতে না পারিলে আমরা দুঃখিত হইব; কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা সত্য, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পরিত্যাগ করিব না। অন্যেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিক বা না দিক আমরা আমাদের পথে চলিবই। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোক আমাদের পরিত্যাগও করে তবু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিবে। বলুন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে আমরা কোনো-রকম আপস করিব না।

বন্ধুগণ, এখন সময় আসিয়াছে মুক্তিপ্রেমিক সকলের এক সুখী ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি বাহিনী গড়িয়া তোলার।

এই বাহিনী শুধু মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইবার যোদ্ধৃদল পাঠাইবে না: মুক্তির নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচারকও পাঠাইবে। আপনাদের মধ্য হইতেই এই প্রচারক ও যোদ্ধার দল গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের কর্মসূচীতে একদিকে ব্যাপক ও নিবিড় প্রচারের ব্যবস্থা থাকিবে, আর-এক দিকে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়িয়া তোলা হইবে। আমাদের প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে ও কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে যাইবে ও তাহাদের কাছে মুক্তির নূতন বাণী প্রচার করিবে। তাহারা তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবে ও সারা দেশে যুব-লীগ সংগঠিত করিবে। দেশের সমগ্র নারীশক্তিকে তাহাদের জাগাইয়া তুলিতে

হইবে, কেননা সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান সহযোগিণী রূপে স্থান লইবার জন্য এখন তাহাদের আগাইয়া আসিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই এখন ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতেছেন। আপনাদের দেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই নিঃসন্দেহে বৃহত্তম জাতীয় সংগঠন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শক্তি, প্রভাব ও ক্ষমতা নির্ভর করে শ্রমিক-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন ইত্যাদির উপর। যদি আমরা আমাদের শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত শ্রেণী, যুবগোষ্ঠী ছাত্রসমাজ ও নারী জাতিকে যুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা এমন শক্তি জাগ্রত করিতে পারিব যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিতে সক্ষম হইবে। অতএব, যদি আপনারা সকলে ফলপ্রদ উপায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেবা করিতে চান, তবে আমি যে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনগুলির কথা এইমাত্র বলিলাম সেগুলিকে আপনারা একসঙ্গে জোরদার করুন।

চীন আমাদের পাশেব দেশ। তাই সাম্প্রতিক চীনা ইতিহাস হইতে আমরা পাঠ নিব। চীনের ছাত্ররা তাহাদের মাতৃভূমিব জন্য কী করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করুন। আমরাও কি ভারতের জন্য ঐরূপ করিতে পারি না? আধুনিক চীনের নবজাগৃতি আনিয়াছে চীনের ছাত্রছাত্রীগণ। তাহারা একদিকে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, কলকারখানায় গিয়া নূতন মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছে, আর একদিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা চীনকে সংগঠিত করিয়াছে। ভারতেরও আমাদের তাহাই করিতে হইবে। মুক্তি লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নাই। মুক্তির পথ নিঃসন্দেহেই কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু উহাই গৌরব ও অমরত্ব লাভেরও পথ। আসুন, আমরা অতীতের বন্ধন চূর্ণ করি, যুগ যুগ ধরিয়া যে-সকল বাধা আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেগুলিকে ধ্বংস করি এবং যথার্থ তীর্থযাত্রীর মতো কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মুক্তির লক্ষ্য অভিমুখে আগাইয়া চলি। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ করিলে শাশ্বত গৌরব অর্জন করা যাইবে। সেজন্য আসুন আমরা স্বাধীন হইবার সংকল্প লই, স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হই। আমরা আমাদের আচরণ ও চরিত্রের দ্বারা এ কথা যেন প্রমাণ করিতে পারি যে আমরা মহান শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের স্বদেশবাসী হইবার যোগ্য। বন্দেমাতরম্।

অক্টোবর ১৯২৯

স্বাধীন ভারতের উত্তরাধিকারী

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারা আমার পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক। এই ধরনের একটি ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে পারা শুধু আনন্দেরই নয়, পরম সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। তোমাদের স্তুতির জন্য বলিতেছি না, ইহা আমার অন্তরের গভীরতম কথা। ইহাতে কোনো অতিরঞ্জন নাই। কেননা ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেই আমার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। সকল দ্বিধা-সংকোচ দূর হয়, আমার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। সকল দ্বিধা-সংকোচ দূরে হয়, আমার জীবনের চরম সত্যগুলিকে অকপটে প্রকাশ করিতে পারি। প্রায় এক দশক আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগন ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। তবু আজও আমি নিজেকে ছাত্র ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। শুধু প্রভেদ এই তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বর্তমানে এক বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি— উহাকে সহজভাবেই 'জীবনের বিশ্ব-বিদ্যালয়' বলা যাইতে পারে। আমি জীবন সংগ্রামে নিযুক্ত এবং তাহা হইতে নিতানূতন বাণী ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিতেছি। আদর্শবাদ এবং কল্পনা-প্রসূত ভাবপ্রবণতা— যাহা ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য— আমাকে এখনো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাই। সুতরাং তোমাদের অভাব ও ক্ষোভ, আনন্দ ও বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমার পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব নয়।

তবুও এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কিনা সে সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় রহিয়াছে। ছাত্রজীবনের আচরণের দিক হইতে আমাকে বিচার করিলে আশংকা হয় আমাকে খুব সৎ কিম্বা নিষ্কলংক পাইবে না। সেদিনের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে আছে, যেদিন অধ্যক্ষমহাশয় আমাকে তাঁহার সমক্ষে ডাকাইয়া আনিয়া কলেজ হইতে বহিষ্কারের আদেশ জানাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনো আমার কানে বাজিতেছে : 'তুমিই এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সব চাইতে নষ্টের গোড়া।'

আমার জীবনের সে এক পরম স্মরণীয় দিন। নানাদিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় সেদিন হইতে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। সেদিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম কোনো মহান আদর্শের জন্য নির্যাতন ভোগের পর কী স্বর্গীয় আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া

থাকে। জীবনের অন্য কোন্ আনন্দ এই অপার আনন্দের সহিত তুলনীয় হইতে পারে? ইহার সহিত তুলনায় আর সকল অবস্থাই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্বে সামাজিক নৈতিকতার এবং জাতীয়তাবাদের তত্ত্বগত ধারণার সহিত কিছুটা পরিচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিনই প্রায় সকল ধারণার পরীক্ষা হইয়া গেল— তাহা অগ্নিপরীক্ষাই বটে। সেই কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম আমার জীবনের গতি ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম চিরকালের জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, তোমরা হয়তো ভাবিতেছ যে আমি এক অদ্ভুত ব্যক্তি, তোমাদের সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজের কথাই চর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু আমি এখানে কেন আসিয়াছি? তোমরা কি আমার আসিবার উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারিয়াছ? নিশ্চয়ই আমি নীতিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিছক দীর্ঘ তত্ত্বোপদেশ দিতে আসি নাই। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আমি আসিয়াছি। ইহা কি সত্য নয় যে একমাত্র অভিজ্ঞতা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়া যাহা আমরা লিখিয়া থাকি তাহারই যথার্থ মূল্য আছে?

ভারতের সর্বত্র আজ এক ব্যাপক আলোড়ন শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মত ও আদর্শের সংঘাত চলিতেছে। নানা প্রকৃতির আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে। তাহার কতকগুলি সংস্কারমূলক। বর্তমান অবস্থার উন্নয়নই তাহাদের লক্ষ্য। অপর কতকগুলি বৈপ্লবিক ধরনের— বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণরূপে নূতন ব্যবস্থার পত্তন করিতে চায়। এই সংঘাতের মধ্য দিয়া নূতন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তাহার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহারা সজীব ও তরুণ, মহান আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ অথচ আত্ম-সংযত, যাহারা স্বীয় আদর্শের সহিত জাতির আদর্শের সার্থক সমন্বয় স্থাপন করিয়াছে, যাহারা ইতিহাস-পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করিয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই এই প্রকার দায়িত্বশীল কাজের উপযুক্ত। বর্তমানের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে একমাত্র তাহারাই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথের সন্ধান আবিষ্কারের সুযোগ দিতে পারে।

ভারতে সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত বিভিন্ন আন্দোলনগুলি একটি একটি করিয়া বিশ্লেষণের পর সেগুলি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইলে, দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং একদিনের বক্তৃতায় তাহা সমাধা করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব। কিন্তু একটি কথা জোর দিয়া বলিতে চাই। আমাদের এই কালজীর্ণ দেশে যদি যৌবনের পুনরুজ্জীবন চাই, সমগ্র ভারতবর্ষকে যদি একটি মহান জাতিরূপে সংহত করিতে চাই, তবে আমাদের ভালোমন্দ বোধের নৈতিকতার মজ্জাগত পুরানো ধারণা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে গেলে আমাদের পুরাতন অথচ বর্তমানেও প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যগুলির পুনর্মূল্যায়ন করিতে হইবে।

গভীর বিচার ছাড়াই, আপাতদৃষ্টিতেই দেখা যাইবে যে আমাদের দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলি দৃঢ়মূল নহে, একান্তই ভাসা ভাসা; মানুষের আত্মার গভীরে আবেদন সৃষ্টি না করিয়া, অভাব-অভিযোগের প্রান্তসীমা মাত্র স্পর্শ করিয়াছে। অবশ্য আমার বলার উদ্দেশ্য ইহা নয়। এগুলি কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে না, করিতেও পারিবে না। আসলে ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ। সমগ্র জাতিকে জাগাইতে হইলে এইরূপ অগভীর আন্দোলন দৃশ্যত আমাদের কোনো কাজে আসিবে না। আমাদের চরম লক্ষ্য জাতির জাগরণ। কোনো অগভীর জাগরণ নহে। অন্তরাত্মার জাগরণ। সুতরাং সমগ্র জাতিকে জাগাইবার জন্য আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। অনতিকালমধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমাদের এই প্রাচীন দেশের সভ্যতাও প্রাচীন। তৎসত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় নাই। জাতি হিসাবে আমরা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত বীরোচিতভাবে অতিক্রম করিয়াছি। কখনো কখনো পযুর্দস্ত হইলেও আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাই নাই। যদি কখনো শ্রান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকি, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। কারণ ঐ-সব মুহূর্তে আমাদের বিশ্রামের সুযোগ আনিয়া দিয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করে। আজ আমরা ক্লান্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমরা মৃত নহি! জাতি ও ব্যক্তি হিসাবে, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে, সৃজনীপ্রতিভার জন্য, আমাদেব গৌরব বোধ করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে। এইগুলিই প্রাণ-স্পন্দনের সুনিশ্চিত লক্ষণ। আমাদের মধ্যে এই ধরনের একজনও অবশিষ্ট না থাকিলে, জাতির জাগরণের সকল আশাই বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু প্রাণ-স্পন্দন আমাদের সংশয় করিবার নয়। জাতির পুনর্জাগরণের জন্য সকল উপাদানও সমভাবে বিদ্যমান। এই কারণেই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার উদ্দীপনা এখনো আমাদের অন্তরে রহিয়াছে।

এই অন্তরাত্মার জাগরণ চাই। একমাত্র এই জাগরণই আমাদের জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটাইবে। আধাআধি সংস্কার কিম্বা বাহ্যিক পালিশে কোনো কাজ হইবে না। সম্পূর্ণ নূতন জীবনে উত্তরণের জন্য আমাদের চাই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে আমরা 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' আখ্যায়িত করিতে পারি।

'বিপ্লব' কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লব কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাস করে না, এমন একটি লোকেরও এ-যাবৎ সাক্ষাৎ পাই নাই। 'বিবর্তন' ও 'বিপ্লব'-এর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই। অল্পসময়ের মধ্যে বিবর্তন বিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়, দীর্ঘতর সময়ের মধ্যে সম্পাদিত বিপ্লবকেই বলে বিবর্তন। এই দুইটি প্রত্যয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে পরিবর্তনের ধারণা। দুইটি প্রত্যয়েরই নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। একটি আর-একটির বিকল্প হইতে পারে না।

আগেই বলিয়াছি, ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আমাদের করিতে হইবে। আমি আরো বলিয়াছি আমাদের গতানুগতিক অস্তিত্বের কাঠামোকে ঢালিয়া সাজা প্রয়োজন। সেই পথেই জাতির প্রকৃত সংহতি সৃষ্টি হইয়া সভ্যজগতে আমাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দান করিবে। যে জীবন প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে কোনো বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহার কিছু মূল্য আছে। যে জাতির কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তার বাঁচিবারও অধিকার নাই। আমি সেজন্য এ কথা কখনোই বলিব না যে কেবলমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কোনো জাতি উন্নতির চেষ্টা করিবে। মানবসমাজে ঔদার্য ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী মানুষের পক্ষে মহত্তর ও সুন্দরতর আবাসযোগ্য স্থান হইয়া উঠে।

জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই ভারতে রহিয়াছে— বৈষয়িক, নৈতিক, আত্মিক— যে-কোনো দিকেই তাকাই-না কেন, ইহার কোনো অভাব গোচরে আসে না। ভারতের ইতিহাস কত প্রাচীন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা এই ভারতবর্ষ মৃত নয়, এখনো জীবিত। ভারতবর্ষ কেন বাঁচিয়া আছে? শুধু কি তাহার গৌরব ও মহত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের জন্য? ভারতবর্ষ বাঁচিয়া রহিয়াছে এই কারণে যে

বিশ্বের ভাণ্ডারে এখনো বৃহত্তর ও গৌরবোজ্জ্বল কিছু তাহার দান করিবার রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য কী? তাহার জনসমাজের কার্যক্রম কী? প্রথমত তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তারপর বিশ্বের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে হইবে। অজস্র বাধা সত্ত্বেও, অতীতে ভারতবর্ষের অবদান অকিঞ্চিৎকর নহে। সুতরাং আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি, যদি বাধাহীনভাবে নিজের পথে বিকাশের স্বাধীনতা থাকিত, তবে মানব-জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারত কী পরিমাণ দান করিতে পারিত।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যদি আমাদের দেশবাসীর মনে অন্তহীন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিতাম ভারতবর্ষ অবিশ্বাস্য কর্ম-সাধন করিয়া বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারিত। আমাদের এই সুপ্ত জাতি একবার জাগিয়া উঠিলে প্রথম সারির অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিসমূহকে অনায়াসেই পিছনে ফেলিয়া যাইবে। আমাদের প্রয়োজন একটি যাদুদণ্ড যাহার স্পর্শমাত্র একটি বিচ্ছুরিত শিহরণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইযা আত্মিক প্রস্তুতির আহ্বান জানাইবে। ফরাসী দার্শনিক বের্গস' 'এলান ভাইটাল' অর্থাৎ প্রেরণা-দায়িনী শক্তির কথা বলিয়াছেন, ইহা সেই প্রাণশক্তি যাহা পৃথিবীকে কর্ম-সাধনার ও প্রগতির পথে প্রবর্তিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি কী হইতে পারে? স্বাধীনতা, আত্মবিকাশ অথবা আত্মোন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আকুতি যাহা আমাদের মনের গভীরে নিহিত রহিয়াছে। সকল প্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আত্মবিকাশের জন্য বেগবান প্রবণতার অপর একটি দিক মাত্র। যদি সত্যই তোমরা বন্ধনমুক্ত হইতে চাও, বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য দ্বিধাহীনভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং স্বাধীনতার পথে সকল অন্তরায় চুর-মার করিয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রকার বিদ্রোহে তোমাদের সাফল্য স্বাধীনতা অর্জনের মতোই প্রতিষ্ঠা পাইবে। যাহাদের আত্মসম্মানবোধ সর্বতোভাবে লুপ্ত হইযাছে, তাহাদের কথা ছাড়িযা দিলে অবশিষ্টেরা সর্বদাই দাসত্বের জ্বালা ও অবমাননা বোধ করে। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সেই অনুভূতি যতই বিভিন্ন মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকুক-না কেন। এই অনুভূতি তীব্র হইয়া উঠিলে বন্ধন আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় পৌঁছাইলে সকল বন্ধনে অস্থির হইয়া পড়িতে হয় এবং যদি সেই অবসরে সামান্য মুক্তির স্বাদও আমরা পাই, বন্ধনমোচনের অস্থিরতা আরো বাড়িয়া উঠে। আমাদের মতো সাধারণ

মানুষ অপর কোনো স্বাধীন দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতে অথবা সে দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া সেখানকার পরিস্থিতি ও পরিবেশের মননার দ্বারা স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করিয়া থাকি। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যে-কোনো জাতিকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

এই পরীক্ষার প্রকৃতি কী? একদিকে সকল প্রকার জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে, জাতিধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে, অপরপক্ষে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই প্রবলতর করিয়া তুলিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই কঠিন পরীক্ষা ও তপস্যার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সংগ্রামে উপযুক্ত উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য আমাদের শুরু করিতে হইবে ইতিহাস পাঠ দিয়া এবং ভারতবর্ষের জনগণের পতনের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যালোচনার সময় মনোযোগ সহকারে পরাধীন দেশের অবস্থার সহিত স্বাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিতে হইবে।

Baptism, মন্ত্রগুপ্তি অনুষ্ঠান বা দীক্ষার একটিই অর্থ: স্বাধীনতার বেদীতে আত্মনিবেদনের সংকল্প গ্রহণ। সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন একদিনে আয়ত্ত করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হইবে ততই আমরা আমাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিব। ভাষায় এই অনুভূতি ব্যক্ত করা যাইবে না। এই আনন্দের সন্ধান পাইলে জীবনের মহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি আমাদের বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিবে; আমাদের সকল অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর ঘটিবে। অতঃপর আমাদের জীবনে একমাত্র স্বাধীনতারই মূল্য থাকিবে এবং সকল অন্তর দিয়া, আর কাহারো নহে কেবল স্বাধীনতার পূজা করিয়া, জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির, আমাদের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটিবে। তখন আমরা একমাত্র সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিব। এই রূপান্তরকালের অনুভূতির সঠিক বিবরণ ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু এ কথা বলা যায় একবার এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হইয়া গেলে আমরা নবজন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত অর্থে 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্ত হইব। তারপর আমাদের অন্তর সর্বদাই স্বাধীনতার স্বাদে সেই ভাবনায় ভরিয়া থাকিবে। আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে থাকিব। স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা, যাহা জীবনের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা— আমাদের সকল কর্মে তাহার অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে।

এক কথায় বলিতে হয় : আমরা স্বাধীনতার ভাবনায় উদ্বেলিত হইয়া, সেই অমূল্য সম্পদ করায়ত্ত করিতে জীবনের সর্বস্ব পণ করিব।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একবার হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, তাহা তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি থাকিবে না। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের সকল প্রকার সংগত ও সম্ভাব্য পথ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তি ও তেজ সংহত করিতে হইবে। এতকাল যাহা শিখিয়াছি তাহার অনেক কিছুই ভুলিয়া যাইতে হইবে। আর এতদিন যাহা শিখি নাই, তাহা নূতন করিয়া এখন শিখিতে হইবে। যেহেতু স্বাধীনতার গুরু দায়িত্ব আমাদের বহন করিতে হইবে, সে কারণে আমাদের শরীর ও মনের শক্তি নূতন উদ্যমে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যেমন পড়িতে হইবে নূতন পাঠ, তেমনি সাময়িক উপভোগ এবং বিলাসব্যসনগুলির মতো জীবনের বহির্ভাগের মৃত খোলস ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এক কথায়, পুরানো অভ্যাস বর্জন করিয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে জীবনের নূতন গতিপথ অবলম্বন করিতে হইবে। এইভাবে শক্তিমান ও কলুষমুক্ত হইয়া সামগ্রিকভাবে জীবন পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিবে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিব।

আসলে ব্যক্তিমানুষ একটি সামাজিক সত্তা। তাহাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়। শরীরের ও আত্মার সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির এবং মানসিক পুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে সমাজের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে সমাজের অবাধ উন্নতি ব্যতিরেকে ব্যক্তি-মানুষের একক উন্নতির কোনো সার্থকতা বা ব্যবহারিক মূল্য নাই। কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ সমাজে গ্রহণীয় নয়। আদর্শের সামাজিক কোনো তাৎপর্য নাই। আমার নিকট তাহার কোনো গুরুত্বও নাই, সুতরাং যদি স্বাধীনতাকে আমাদের জীবনের মৌলিক নীতিরূপে গ্রহণ করি এবং ইহাতেই আমাদের সকল উদ্যোগ ও কর্মের প্রেরণার উৎসমূল রূপে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহান আদর্শের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর সমাজ-সংস্কারের উৎসমূল স্থাপন করিতে হইবে। অচিরেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব, যে সক্রিয় নীতিটি স্বাধীনতার আদর্শের পিছনে নিহিত রহিয়াছে, তাহা সমাজ-বিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়। সমগ্র সমাজের স্বাধীনতার কথা বলিলে

বুঝিতে হইবে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতার কথাই বলা হইতেছে। উচ্চবর্ণের স্বাধীনতার সহিত তথাকথিত অনগ্রসর বর্ণের স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিতে হইবে। স্বাধীনতার সংজ্ঞায় বিত্তবান ও দরিদ্রের, নবীন ও প্রবীণের এবং সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনতাই স্বীকৃত। সকল শ্রেণীর ও ব্যক্তির, সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যে-কোনো সম্প্রদায়েরই তাহারা হউক-না কেন, বলা বাহুল্য বিনা বৈষম্যে তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে স্বাধীনতা ও সমতা একার্থক এবং আমরা জানি সমতাবোধ আমাদের সৌভ্রাত্রের অধিকারী করিয়া তোলে।

কোনো সমাজ বন্ধনমুক্ত হইবার পূর্বে, সেই সমাজে আইন ও সামাজিক বিষয়ে নারীদের প্রতি পুরুষের সমানাধিকার প্রসারিত হওয়া কর্তব্য। যে-সকল সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য কোনো কোনো শ্রেণী ও ব্যক্তির স্থান সমাজে নামাইয়া দিয়াছে, নির্মমভাবে সেগুলি ধ্বংস করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক মর্যাদার প্রভেদের অবসান করিতে হইবে। সমাজ-প্রগতির পথে নির্বিশেষে সকল প্রকার অবরোধ বর্জন করিতে হইবে। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিতে হইবে। যুবক বলিয়া যৌবনশক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করা চলিবে না। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত তরুণ এবং তরুণীদের উপর সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার এবং সরকার-পরিচালনার দায়িত্ব অর্জন করিতে হইবে। সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক—প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমানাধিকার থাকিবে, সামান্যতম বৈষম্যও অনুমোদন করা যাইবে না। সকলের জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ, সম্পত্তির সমান বণ্টন, বৈষম্যমূলক সকল সামাজিক আইনের পরিহার, জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশের মুক্তি-সাধন— এই মৌলিক ভিত্তিভূমির উপর আমাদের বাঞ্ছিত নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বন্ধুগণ, তোমাদের মনে হইতে পারে এগুলি আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হইবে। তোমরা কেহ কেহ আমাকে হয়তো বাস্তবসম্পর্কবিহীন দিবা-স্বপ্নে মশগুল বলিয়া ভাবিবে। যদি সেই কারণে আমাকে বর্জন কর তবে আমি অসহায়। এই অপবাদ আমাকে মানিয়া লইতে হইবে এবং প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতে হইবে যে বাস্তবিকই আমি দিবাস্বপ্নবিলাসী। আমি কোন্ স্বপ্নে বিভোর একের পর এক তাহা তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছি। আমার নিকট সেগুলি বাস্তবে মণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই স্বপ্নগুলি

হইতেই আমার জীবনের প্রেরণা ও শক্তি আহরণ করিয়া থাকি। এই স্বপ্ন-বর্জিত হইলে আমার জীবন অর্থহীন, মাধুর্যহীন হইয়া আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিত, শুধু তাই নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ এবং শূন্যগর্ভ দর্শনীয়রূপে পর্যবসিত হইত। আপন মহিমায় উজ্জ্বল, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমার অতি প্রিয় স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি, ভারতবর্ষ আপন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সানন্দে ও অবাধ অধিকারে তাঁহার সন্তান-সন্ততিদের ভাগ্য পরিচালনা করিতেছেন। আমি স্বপ্নে দেখি স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে প্রসারিত স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনীসহ একটি সার্বভৌম ভারতীয় কমন-ওয়েলথ্ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি স্বপ্ন দেখি স্বাধীন ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাহার দূত পাঠাইয়াছে! আমি মহৎ স্বপ্নে বিভোর হইয়া দেখিতে চাই যে আমাদের ধাত্রী ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ বিশ্বের সম্মুখে উচ্চশির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বপ্নও বটে, আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাও বটে যে, আমাদের এই ভারতবর্ষ সত্য ও স্বাধীনতার বাণী বিশ্বের সকল দেশে প্রেরণ করিবে।

আমার প্রিয় ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ তোমরা নিছক ছাত্র হইতে পার, কিন্তু আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে এবং স্বাধীন ভারতের তোমরাই উত্তরাধিকারী। এজন্যই আমার কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের শরিক হইবার জন্য হৃদ্যতার সহিত তোমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছি। তোমাদের উপহার দিবার মতো আমার আর কিছু নাই। তোমরা কি ইহা গ্রহণ করিবে না? তোমরা সতেজ এবং তরুণ, হৃদয় নূতন আশায় কানায় কানায় ভরপুর। জীবনের মহত্তর এবং উচ্চতর আদর্শসমূহ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হওয়া উচিত। আদর্শ যতই উচ্চতর হইবে, ততই তোমাদের সুপ্তশক্তিসমূহকে আরো উত্তমরূপে জাগ্রত করিয়া তুলিবে। অতএব প্রিয় ছাত্রগণ উত্তিষ্ঠ হও, জাগ্রত হও। আপন বৃত্তিতে নিজেকে জাগ্রত করিয়া তোলাই ছাত্রদের একমাত্র করণীয় নহে। আরো উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। একমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই তো মানুষ জীবনধারণ করে না। খাদ্য ও বস্ত্রের উদার সরবরাহ হইলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। আমি তোমাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছি। স্বপ্নের এই চিত্র বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে, তোমাদের সকলকেই কোনো-না কোনো কর্মে নিযুক্ত

হইতে হইবে। যত সামান্যই হউক-না কেন, তোমাদের কিছু পরিমাণে আত্ম-ত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে আগামী দিনগুলিতে নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত থাকো। আগামীকাল তোমাদের উপর যে কঠিন দাবি আসিবে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য শরীর ও মনে শক্তি সঞ্চয় করো। তোমাদের সকল প্রকার পাঠগ্রহণ এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

জীবনের যে চিত্র আমি এখানে তোমাদের নিকট উন্মোচিত করিয়াছি তাহাতে অন্তহীন দুঃখ নিপীড়ন নিহিত রহিয়াছে। তাহা অস্বীকার করিবার নয়। আমাকে বিশ্বাস করো তাহার ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যে প্রচুর আনন্দও ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। তোমাদের জন্য যে পথরেখা অনাবৃত করিয়াছি তাহা নিঃসংশয়ে কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু এই পথরেখাই কি গৌরবের একমাত্র পথ নহে? স্বাধীনতার এই তীর্থ-পরিক্রমায় ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত ধরিয়া অভিযানে যোগ দিবার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাইতেছি। মানব-জীবনে এইভাবে আমরা সর্বোত্তম পুরস্কার লাভ করিব। যদি আকাশ ব্যর্থতা ও নিপীড়নে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, দুঃখ ও বেদনাবোধ প্রতিপদে প্রতিহত করে, তথাপি অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছিয়া বিধাতার বিধানে অপার আনন্দ এবং শাশ্বত জীবনের অধিকার আমরা লাভ করিবই।

'বন্দেমাতরম'।

ডিসেম্বর ১৯২৯

স্বাধীনতার অখণ্ডরূপ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত বন্ধুবর্গ :

আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে— যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন ? ইহার কারণ নির্দেশ করা খুবই সহজ। সর্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহা চায়, তাহা পায় না, যে আদর্শকে ভালোবাসে সে আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর বীতশ্রদ্ধ ভাব এবং নূতন কর্মের ও নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা —এই-সব কারণের সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি।

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বোঝেন কয় জন ? যুব-সমিতিকে সেবা-সমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও label বদলাইয়া যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে— বিশিষ্ট কর্মপ্রণালী আছে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার দরুন যাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পাণ্ডা সাজেন তাঁহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনো সেবা বা উন্নতি হইবে না এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাঁহারা স্থির থাকিতে না পারার দরুন যুব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাঁহাদের দ্বারাও কোনো বড়ো কাজ হইবে না।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি— বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁটি কর্মী আছেন— যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কামভাবে এই কর্মে যোগদান করিয়াছেন, অবশ্য যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় একটি কথা বার বার

বলা প্রয়োজন— সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেবা-সমিতির শাখা-বিশেষ নয়। যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য— নূতনের সন্ধান আনা, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা, মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া, এই আকাঙ্ক্ষা যাহার মধ্যে জাগিয়াছে, সে ব্যক্তি নূতনের জন্য, মহত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে— সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া পারে না। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে— যে ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে— সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব-সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে।

পূর্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব-আন্দোলন কোনোদিন জন্মিত না। কিন্তু দৃষ্টির সংকীর্ণতার দরুনই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের দরুনই হউক— তাহা হয় নাই। তরুণ প্রাণ বহুদিন যাবৎ অপরের স্কন্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল যে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সব ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখিবে ফলাফল কী হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল যে কল্যাণকৃৎ কখনো দুর্গতি-প্রাপ্ত হইবে না ("নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি") এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে ভরসা করিয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনো অশুভ হইবে না; জয়লাভ করিলে সে বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে• এবং জয়ের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে— (হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং)।

• যুব-আন্দোলন— যুবক-যুবতীদেরই আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, মনুষ্য সমাজকে ও মনুষ্য-সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করিতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়, প্রকৃতির বুকে যেরূপ ever green পাদপ পাওয়া যায়— মানুষের প্রাণকেও তদ্রূপ নিত্য সবুজ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের

বিরুদ্ধে, বিজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমি গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম —The voice of Krishna was the voice of immortal youth— গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী।

যাঁহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগরপারের সামগ্রী— তার জন্ম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তার জন্মদাতা জার্মানীর Karl Fisher (কার্ল ফিসার) তাঁহারা কিছুই জানেন না এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যতদিন আছে— যুব-আন্দোলনও ততদিন আছে। তবে বর্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নূতন হইলেও বহু পুরাতন, যুগে যুগে এই আদর্শবাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নূতন শক্তি দান করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশে মানুষ "ধর্ম-রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন চাহিত— তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙিয়া "ধর্ম-রাজ্য" স্থাপন করিতে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সেখানকার ঋষিরা স্বপ্ন দেখিত— Ideal Republic-এর— আদর্শ প্রজাতন্ত্রমূলক সমাজের। তার পর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মনীষী কত utopia-র স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন New age-এর (নূতন যুগের) কথা— কেহ লিখিতেছেন great society-র (বৃহত্তর সমাজের) কথা— কেহ লিখিতেছেন millenium-এর কথা— কেহ লিখিতেছেন অনাগত সত্য যুগের কথা— কেহ লিখিতেছেন Socialist State (সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের) কথা। নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের পর যুগ একটা আদর্শ সমাজের এবং আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে কী প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্যে আমরা Superman (অতিমানুষ)-এর কথা শুনিতে পাই। Superman-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়— কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান্ সত্য নিহিত আছে। Superman-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক Nietzsche (নীট্‌শে) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন— কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ Superman-এর (অতিমানুষের) স্বপ্ন দেখেন না— সে জাতির কি idealism বা আদর্শবাদ আছে? এবং যে জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত— সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে?

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়— তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়— তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফুরণ যদি ঘটাইতে হয়— তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই। খ্রীস্টীয়দের 'বাইবেল'-এ (Bible) একটা কথা আছে— man does not live by bread alone— শুধু উদর পূরণের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তার জীবন ধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য কি— সে কেন বাঁচিয়া আছে— তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে। এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমতো না পায়, তাহা হইলে সে জীবনে শান্তি পায় না— নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে— এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। অনুভূতি ও আস্বাদ নিজে যে পায় নাই— সে অপরকে তাহা কি করিয়া দিবে?

স্বপ্ন অনেকের ছিল, অনেকের আছে, আমাদের স্বর্গীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর আনন্দের নির্ঝর। তাঁর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে এবং এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলাফেরা করি, লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি? আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না— যে সমাজে জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না— যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমানভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে

না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকিবে এবং অলসের ও নিষ্কর্মার কোনো স্থান থাকিবে না, যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে— আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট একটা অখণ্ড সত্য, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব-কিছু করা যায়, সর্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করা যায়, সর্বপ্রকারের কষ্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণবিসর্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান।" হে তরুণ ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমাদের দিবার মতো সম্পদ আমার কিছু নাই— আছে শুধু এই স্বপ্ন— যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহার স্বরূপ দিতেছি— গ্রহণ করো।

আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক মজার সমালোচনা শুনিতে পাই— তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা নাকি "যুব-সমিতি"গুলি Capture বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে— তাহাদের বিরুদ্ধে Capture-এর অভিযোগ হাস্যাস্পদ বটে; আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র-আন্দোলনের এই নবাগত বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন? যাহারা গোড়া থেকে এই আন্দোলনের সৃষ্টির ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা আজ Capture অপরাধে অপরাধী এবং যাঁহারা প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন Capture করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন —তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী। গত কলিকাতা-কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করি। সেই বিস্তৃত কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল— "To assist students' movement, youth movement and Physical Culture movement"— অর্থাৎ ছাত্র-আন্দোলন, যুব-

আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে হইবে। এই কর্মপদ্ধতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তখন কোনো আপত্তি শোনা যায় নাই; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে যখন দলের স্বার্থপোষণের জন্য অপরকে গালাগালি দেওয়া দরকার হইল তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমরা নাকি যুব-সমিতিগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের যদি কোনো অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করি নাই। ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দিন দিন নিষ্কর্মা হইয়া পড়িতেছে। বাংলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সমিতিগুলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে কিন্তু যাঁহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন — সেই নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্তৃপক্ষেরা—এ কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা (propaganda) করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি করিয়াছেন? কোনো কোনো প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব কর্মঠ ও উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু বাংলা দেশে যুব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরোধী।

আর-এক প্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই— আমরা নাকি অপরকে কাজ করিবার সুযোগ দেই না। কাজ করিবার সুযোগ কে কাকে দেয়? আমাদেরই বা কাজ করিবার সুযোগ কে দিয়াছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে নিজ শক্তিবলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লয়, মাতা যেরূপ শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন— তার জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিতে হয় না, কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে আমরা কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছি না— আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে না। যে ব্যক্তি [illegible]গত অভিযোগ করে যে, যে কাজ করিবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না—সে কস্মিনকালেও তাহা পাইবে না। এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্মক্ষেত্রের অভাব কোনো দিন হয় না। বাংলার

বে-আন্দোলনের কর্ণধাররূপে যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারাও কি কাজ করিবার সুযোগ-সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই ?

বাংলাদেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া আছে। বর্তমানে দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুগিয়া থাকি আমরা, কারণ সহানুভূতির জন্য, অর্থসাহায্যের জন্য আমাদের বার বার জনসাধারণের শরণাপন্ন হইতে হয়। ঝগড়া-বিবাদ থাকিলে আমরা সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই না— অর্থ তো পাই-ই না— পাই শুধু অনাবিল গালাগালি। বিবাদ-কলহ যতদিন চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ থাকিবে — এ কথা অত্যুক্তি নয়। সুতরাং বিবাদ মিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া করা এবং আমরা কাজকর্ম ফেলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাঁধিয়াছি ঝগড়া করিতে। কংগ্রেস একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান — কংগ্রেস Social Service League-এর নামান্তর নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকা অনিবার্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক স্থলে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতানৈক্য অনেক সময়ে মনান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপরে যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরো তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না করিয়া কাহারো উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়— ঝগড়া-বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের অনর্থক বদনামের ভাগী করা কাহারো উচিত নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য এবং মতান্তরের জন্য ঝগড়া বিবাদ হওয়াও বোধ হয় তদ্রূপ অনিবার্য। কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগালি যেন আমাদের স্বভাব না হইয়া দাঁড়ায়— এ বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর যে আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে ভোটের পরিবর্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ না করি, তবে হইলে দেশের দুর্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতার ছাত্র-

সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয়। তার পূর্বে চট্টগ্রামে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান সুখেন্দুবিকাশ দত্তের মতো চতুর্দশ বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল— তাহা ভুলিবার নয়। সব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তব্য স্থির করা উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এ-সব ব্যাপারে ধামা-চাপা দিয়া কোনো লাভ নাই। সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা গুণ্ডামির আশ্রয় দেয় তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে ইহার পরিণাম কি। প্রথমত যে ব্যক্তি অপরের উপর গুণ্ডামি করে তার জানা উচিত যে একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে— কারণ সব মানুষ সমানভাবে সহিষ্ণু ও অহিংস নয়। তারপর আর-একটি কথা তার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না— সুতরাং গুণ্ডামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহানুভূতি ও ভালোবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া থাকে।

আজকাল যুব আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয়, তার মধ্যে কখনো কখনো কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায় — পথ-নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ পায় না— কোন্ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা উচিত। এ সম্পর্কে "দাদা কোম্পানির" খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এই কোম্পানির সভ্য কোনোদিন ছিলাম না— আশা করি কোনোদিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা একদিন এই কোম্পানির সভ্য ছিলেন তাঁহারা কেন দাদা কোম্পানির প্রতি এত বিরূপ হইয়াছেন? তাঁহাদিগের নিজেদের কোম্পানি এখন liquidation-এ গিয়াছে অথবা তাঁহারা এখন promotion লাভ করিয়া ঠাকুর-দাদার সোপানে উঠিয়াছেন— ইহাই কি তাঁহাদিগের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাংলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে—ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ বাংলা দেশে নাই। যদি কেহ থাকে তবে সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনো কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮/৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই দলাদলি বাংলার রাষ্ট্রীয় গগন কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম ধাক্কা স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল, আমরা অবশ্য তাঁর পার্শ্বে ও পশ্চাতে ছিলাম এবং ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে যে মাসিক ৫০,০০০ টাকার আয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচ হাজারি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া করিবেন। দেশছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই— কারণ দেশবাসীর সংগে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তখন আমরা অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহু দূরে; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াও আমরা যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ফলে কংগ্রেসের জয় হইল। এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা নিজেরা সামনাসামনিভাবে খাইতেছি। ফল যে পূর্ববৎ হইবে এবং কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বিরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগালি আমাদের খাইতে হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে। এই বিরোধের মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনো হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট পাইতাম না।

আর একটা তীব্র সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে সেটা এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া আর কি করিল? আমাদের দেশে যাঁহারা Political minded— যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন করেন না। এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন যে দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য— হাসপাতাল নির্মাণ করা, সেবাসমিতি গঠন করা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা। তাঁহারা হাসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১০০ টাকাও সানন্দে দিবেন না, তাঁহারা বলেন অমুক হাসপাতালে এতগুলি bill হইয়াছে, এতগুলি রোগীর চিকিৎসার আয়োজন

হইয়াছে— কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে? এরূপ প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (—যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে অন্য কোনো রোগ নির্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধি নিরাকরণ করা। আমাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে পর্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারিব সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ সবল ও কর্মঠ জাতি হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম, সম্পদ ও সময় স্বাধীনতা-লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনো মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বুঝানো যায় না। হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝানো যায় রাষ্ট্রীয় উন্নতি সেভাবে বুঝানো যায় না— তাই বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা মনে করেন যে আমরা স্বরাজ্য বা কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং বাজে কাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরো সঞ্চারিত না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না— রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগিলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা বুঝিবেন না— রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং সর্বস্বপণ করিতে না পারিলে জাতি কোনোদিন স্বাধীন হইবে না।

তাই আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে Political-mentality-র বড়োই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায় সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে— তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— আত্মবিকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে জাতি সেদিন মুক্ত হইবে।

জনৈক বন্ধু আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— গত দুই বৎসর

ধরিয়া আপনি কী করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটু তুলনা করা দরকার। গত দুই বৎসরের আগে দুই বৎসর কী হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কী কাজ হইয়াছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত দুই বৎসর বেশি কাজ হউক আর নাই হউক— এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে তবে আছে বাংলায় ও পাঞ্জাবে এবং গত দুই বৎসর বাংলা দেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ বাঙালী সরকার বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তথাপি এ কথা কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিতে চাই না যে আমরা গত দুই বৎসর যাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্হ। আমি শুধু বলিতে চাই এ কথা যে, যে অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে বাংলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ভাঙা হাটের মতো। একে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে— তার উপর আমার বাংলা দেশে ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের বহু কর্মী তখনো কারারুদ্ধ। এই দুর্যোগের মধ্যে আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি।

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তবে একদিকে তাহাকে জোড়া-তালি দিয়া পুরানো প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। যে প্রোগ্রাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি সে প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা নূতন প্রোগ্রাম চাই— কিন্তু নূতন প্রোগ্রাম চাইবার পূর্বে, চাই নূতন মানুষ— যাহারা নূতন প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখনকার কংগ্রেসে আপনি নূতন প্রোগ্রাম লইযা যান— কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না— গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে লাগাইবে না— অর্থাৎ অন্তরের সহিত করিবে না।

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা "প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম" বলিয়া কেবল চীৎকার করেন কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ারি না করিলে সে প্রোগ্রামের মূল্য বুঝিবে কে ?

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে— কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনো আসে নাই— আসিবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে যাঁহারা সেই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ারি করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিরত। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বলিয়া আসিতেছি। এই-সব আন্দোলনের সাহায্যে যদি নূতন মানুষ— পুরুষ ও নারী— প্রস্তুত হয় তখন নূতন প্রোগ্রাম দিলে তার সার্থকতা হইবে।

এই-সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। আমার আদর্শ— দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কী তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলব্ধি করি নাই। অখণ্ড রূপের উপলব্ধি জাতির মানসক্ষেত্রে একদিনে আসে না। বহু দিনের সাধনার ফলে, এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ড রূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ কী। যেদিন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করিবে সেইদিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতি-ভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে। নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কী পুরুষ কী নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বলিয়া জগৎসভায় পরিগণিত হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে— ধর্মেকর্মে— শিক্ষায় দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে জগৎবরেণ্য হইবে।

আমাদের কর্তব্য কী তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না দশভুজারূপে দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই।

ডিসেম্বর ১৯২৯

উল্লেখপঞ্জী

পৃ. ১ ॥ তরুণের আহ্বান

ডিসেম্বর ১৯২২ আর্য সমাজ হলে নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনীর অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

পৃ. ৭ ॥ তরুণের স্বপ্ন

১৬ মে ১৯২৩

পৃ. ১০ ॥ তোমরা সংগঠিত হও

৪ এপ্রিল ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

পৃ. ১২ ॥ ছাত্ররাই স্বাধীনতার অগ্রদূত

১৩ এপ্রিল ১৯২৮ রাজশাহী শহরে ছাত্রগণ-প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ।

পৃ. ১৫ ॥ তরুণের মিশন

২২ মে ১৯২৮ বোম্বাই শহরের অপেরা হাউস-এ প্রদত্ত ভাষণ।

পৃ. ১৮ ॥ তরুণের সাধনা

১৬ জুলাই ১৯২৮ অ্যালবার্ট হল-এ ছাত্র সংগঠন সমিতির উদ্যোগে সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

পৃ. ২৫ ॥ যৌবনই আশা

২২ জুলাই ১৯২৮ পূর্ণ থিয়েটার হল-এ প্রদত্ত ভাষণ।

পৃ. ২৯ ॥ সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত

১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হল-এ নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ৩৮ ॥ তরুণের জাগরণ

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ সর্বদল সম্মেলন মণ্ডপে নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

পৃ. ৪৪ ॥ তরুণ প্রাণের লক্ষণ

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ পাবনা জেলা যুব-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ৫৩ ॥ **আমরা কী করতে পারি**

২২ মার্চ ১৯২৯ বেহালা সেবা সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ

পৃ. ৬৫ ॥ **জননী জাগ্রহি**

৩০ মার্চ ১৯২৯ রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ৮২ ॥ **তোমরা মরণজয়ী**

২৫ এপ্রিল ১৯২৯ শ্রীহট্ট জেলা ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ৯০ ॥ **দেশাত্মবোধই জাতীর আদর্শ**

২২ জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ৯৯ ॥ **তোমরা ওঠো জাগো**

২১ জুলাই ১৯২৯ হুগলী জেলা ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ১০৮ ॥ **আদর্শ সমাজের স্বপ্ন**

১৯ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ১২০ ॥ **স্বাধীন ভারতের উত্তরাধিকারী**

১ ডিসেম্বর ১৯২৯ অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

পৃ. ১৩০ ॥ **স্বাধীনতার অখণ্ডরূপ**

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯ মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।